জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৫

নাগরিক উদ্যোগ

সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

পারিবারিক সহিংসতার উদ্বেগজনক পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়

রাজনৈতিক সংকট ও বিপন্ন মানবাধিকার ॥ বিভিন্ন সংগঠন ও দেশের উদ্বেগ প্রকাশ

শিক্ষা অধিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশের দলিত জনগোষ্ঠী

খাদ্য অধিকারের আইনি স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

নাগরিক উদ্যোগ

সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৫
বর্ষ : ০৪ সংখ্যা : ১ম

সূচিপত্র

রাজনৈতিক সংকট ও বিপন্ন মানবাধিকার ॥ বিভিন্ন সংগঠন ও দেশের উদ্বেগ প্রকাশ/ ৩

সংঘাতময় রাজনীতির অবসান না হলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি দিন-দিন আরও খারাপ হবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছে মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও দেশ। সম্প্রতি বিবৃতি প্রদান করে এসব সংস্থা ও দেশ অবিলম্বে রাজনৈতিক সংকট নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানায়। এসব বিবৃতি সংকলন করে পাঠকের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

পারিবারিক সহিংসতার উদ্বেগজনক পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয় / ৬

দেশে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নৃশংস সহিংসতার শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা। পারিবারিক পরিমণ্ডলে সংঘটিত এসব অপরাধ প্রতিরোধে কোনো কার্যকর উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক সহিংসতা রোধে আমাদের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছেন উন্নয়নকর্মী *এস. এম. শরিফুল ইসলাম*।

খাদ্য অধিকারের আইনি স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ/ ২০

খাদ্য অধিকার পূরণের সহায়ক হিসেবে জনগণের জীবিকা নির্বাহের উপায় নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারে জনগণের প্রবেশগম্যতা শক্তিশালী করার জন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। সার্বিক অর্থে জনগণের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের এ সকল দায়-দায়িত্ব পর্যালোচনা করেছেন উন্নয়নকর্মী *কামরুন্নেসা নাজলী*।

শিক্ষা অধিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশের দলিত জনগোষ্ঠী/ ২৩

বাংলাদেশের সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তাধারার অন্যতম মনোযোগ কেন্দ্র হলো শিক্ষাক্ষেত্র। বাংলাদেশে যেসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এখনো শিক্ষায় পিছিয়ে তার মধ্যে দলিতরা রয়েছে সর্বাগ্রে। শিক্ষা-বঞ্চনার কারণেই তাদের জীবনমানের কোনো উন্নতি ঘটছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে দলিতদের পিছিয়ে থাকার কারণ ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান করেছেন লেখক ও গবেষক মাজহারুল ইসলাম এবং উন্নয়নকর্মী *আফসানা বিনতে আমিন*।

অন্যান্য নিবন্ধ

নারীর প্রতি সহিংসতা: কারণ ও করণীয় অনুসন্ধান ৭
মো. সাখাওয়াত হোসেন

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০ এর কার্যকর প্রয়োগ : স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ১০
সেমিনারে উপস্থাপিত নিবন্ধ

স্থানীয় বিরোধ মীমাংসায় সালিশ : একটি কার্যকর পদ্ধতি ১৪
সেমিনারে উপস্থাপিত নিবন্ধ

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত: সামাজিক সুরক্ষা, আইন ও নীতিমালার অনুসন্ধানে ২৭
সেমিনারে উপস্থাপিত নিবন্ধ

বাংলার পানিশক্তির অবক্ষয়ের কালে ৩০
সেলিম সারোয়ার

নাগরিকদের জানা ভালো : সুনাগরিক হয়ে ওঠার সহায়ক এক উপকরণ ৩২
গ্রন্থ পর্যালোচনা

সম্পাদক
জাকির হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
হোজ্জাতুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ
আলতাফ পারভেজ
মাজহারুল ইসলাম
আফসানা বিনতে আমিন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
বারেক হোসেন মিঠু

আলোকচিত্র
নাগরিক উদ্যোগ ও ইন্টারনেট

প্রকাশক
সম্পাদক কর্তৃক ৮/১৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।

মুদ্রণ
প্রকাশক কর্তৃক নূর কার্ড বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী, ১৯/১, নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
ফোন : ৮১১৫৮৬৮, ফ্যাক্স : ৯১৪১৫১১
ই-মেইল : nuddyog@gmail.com

সম্পাদকীয়

পারিবারিক সহিংসতা রোধে উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি

সম্প্রতি দেশে পারিবারিক সহিংসতার হার ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে। পরকীয়া, দাম্পত্য কলহ, মাদকাসক্তি ও যৌতুকের কারণে স্বামী স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে খুন করছেন। পরিবারের সদস্যদের প্ররোচনায় কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। নৃশংসতার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না শিশুরাও। দেশে পারিবারিক সহিংসতা রোধে সুনির্দিষ্ট আইন বলবৎ থাকলেও আইনের ব্যবহার না থাকা এবং মানুষের সচেতনতার অভাবে পারিবারিক সহিংসতা রোধ সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা নতুন কিছু নয়। সাম্প্রতিককালে পারিবারিক হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতার মাত্রা যেন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। নারী-পুরুষ বৈষমসহ নানা কারণে পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে মাদক, পরকীয়া, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিকতা, পারিবারিক বোঝাপড়ার ঘাটতি, আর্থিক অসচ্ছলতা, বহুবিবাহ, যৌতুক, সামাজিক ও পারিবারিক বৈষম্য, আকাশ-সংস্কৃতির প্রভাব এবং তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার। আধুনিকতার নামে পারিবারিক অনুশাসন আজ অধিকাংশ পরিবারেই অনুপস্থিত। পারস্পরিক মমত্ববোধ, ভালোবাসা কিছু কিছু পরিবার থেকে যেন ক্রমাগত মুছে যাচ্ছে। শিথিল হয়ে পরছে পারিবারিক বন্ধন, দূরত্ব রাড়ছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। আর পারিবারিক বন্ধন যেখানে শিথিল হয়ে পড়ে, সামাজিক নিরাপত্তা সেখানে অক্ষুণ্ন থাকতে পারে না। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালের প্রথম নয় মাসে দেশে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ৩৭৩টি। এর মধ্যে হত্যাকাণ্ড ২৬৯টি এবং আত্মহত্যা ৭২টি। অন্যান্য সহিংসতার ঘটনাগুলোর মধ্যে শারীরিক নির্যাতন গুরুতর।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি আইন থাকলেও সুনির্দিষ্টভাবে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে কোনো আইন ছিল না দীর্ঘদিন। বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অব্যাহত প্রচারাভিযান ও দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১২ অক্টোবর ২০১০ তারিখে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০ প্রণয়ন করে। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে অন্যান্য যেসব আইন আছে সেগুলো মূলত শাস্তিনির্ভর। অর্থাৎ প্রতিপক্ষ বা অপরাধীকে জেল-জরিমানা ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০ এর মূল কথাই হচ্ছে প্রতিরোধ ও সুরক্ষা; অর্থাৎ পারিবারিক বাতাবরণে থেকেই পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আনা। এই আইনের কার্যকর প্রয়োগ করা গেলে পারিবারিক সহিংসতার মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হবে।

পারিবারিক হত্যাকাণ্ডের আগাম কোনো তথ্য না থাকায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পারিবারিক হত্যাকাণ্ড রোধে আগাম কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না। পারিবারিক সহিংসতার ঘটনার ক্ষেত্রে কী করতে হবে- নাগরিকদের অনেকেই তা জানেন না। এক্ষেত্রে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে পারিবারিক সহিংসতা রোধে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে পারিবারিক সহিংসতার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে দক্ষ করে তুলতে হবে, যেন তারা পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পারিবারিক সহিংসতার সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে, তাহলেই কেবল পারিবারিক সহিংসতার মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা যাবে।

রাজনৈতিক সংকট ও বিপন্ন মানবাধিকার ॥ বিভিন্ন সংগঠন ও দেশের উদ্বেগ প্রকাশ

সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির অবসান না হলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি দিন-দিন আরও খারাপ হবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছে মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও দেশ। সম্প্রতি নিজেদের পক্ষ থেকে বিবৃতি প্রদান করে এসব সংস্থা ও দেশ অবিলম্বে রাজনৈতিক সংকট নিরসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানায়। নিম্নে এসব বিবৃতির সংকলন উপস্থাপন করা হলো।

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন

ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION

বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট ও মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ১২ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে 'ক্র্যাকডাউন অন মিডিয়া এন্ড অপজিশন ইনটেন্সিফাইস' শিরোনামের একটি প্রতিবেদনে সংগঠনটি লিখেছে, 'সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকার মিডিয়া ও বিরোধীপক্ষের প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করছে। মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিছু সংবাদ এবং বিরোধীপক্ষের মতামত প্রকাশে সেন্সর আরোপের কথা বলা হয়েছে। একইসাথে বিরোধী রাজনৈতিক জোটের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে গ্রেফতার ও কারাবন্দি করে রাখা হচ্ছে'। কমিশন এই প্রতিবেদনে গত ৭ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে একটি পর্নোগ্রাফি মামলায় একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আবদুস সালামের গ্রেফতার এবং গত বছরের ২৮ ডিসেম্বর ইংরেজি দৈনিক *দ্য নিউ এজ* এর অফিস এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার অভিযান পরিচালনার বিষয়টি তুলে ধরে।

২১ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে 'গভর্মেন্ট ড্রাইভ এগেইনস্ট অপজিশন এন্ড সিটিজেন' শিরোনোমে প্রকাশিত সংগঠনটির ভিন্ন এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকার বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), র‍্যাব ও পুলিশের সমন্বয়ে যৌথ বাহিনী গঠন বিরোধী নেতাকর্মীদের হয়রানি ও দমন করছে। এই বাহিনীর সদস্যরা বিরোধী নেতাকর্মীদের বাসাবাড়িতে গিয়ে সম্পদ হানি এবং নারী ও শিশুদের উপরও অত্যাচার-নির্যাতন করছে।

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়, ৫ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় বিরোধী জোটকে একটি সমাবেশ করতে না দেওয়াকে কেন্দ্র দেশে রাজনৈতিক সংকট আরও ঘণীভূত হয়। এই জোট লাগাতার অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচি আহ্বান করে, বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে ও গণপরিবহণে পেট্রোল বোমা হামলায় অর্ধ-শতাধিক মানুষ নিহত ও শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। এর বিপরীতে সরকার বিরোধী জোটের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও বিনাবিচারে হত্যা করছে। এছাড়াও বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে তার গুলশান কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। সরকার বিরোধ জোটের নেতাকর্মীদের মোবাইল ও টেলিফোনে *ফিনফিশার* সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে আঁড়িপাতছে এবং ভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ বন্ধের জন্য ভাইবার, ট্যাংগো, হোয়াটস্ অ্যাপ বন্ধ করে দিয়েছে।

২৩ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত 'প্রটেস্ট র‍্যালিস্ মাস্ট বি পিসফুল' শিরোনামের আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে ঢাকায় কোনো ধরনের র‍্যালি, মানববন্ধন বা সভা-সমাবেশের আয়োজন করা নিরাপদ নয়। যেকেউ যেকোনো সময় এ ধরনের কোনো র‍্যালি বা সমাবেশে হামলা করতে পারে বলে প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে এ ধরনের হামলার ঘটনা ঘটলেও তারা কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয় নি বলে কমিশন তাদের এই প্রতিবেদনে দাবি করেছে।

'স্টপ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স এন্ড এক্সট্রা জুডিশিয়াল এক্সিকিউশান' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন। ২৮ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫-২৭ জানুয়ারি সময়কালে দুইজন নারীসহ নয় জন মানুষ গুম হয়েছেন এবং ৭ জন মানুষ বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। বিজিবি, র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনী এদেরকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলে প্রতিবেদনটিতে দাবি করা হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ

হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ ২৯ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত ২০১৫ ওয়ার্ল্ড রিপোর্টে বলেছে যে, বাংলাদেশ সরকার হত্যা, গুম ও নির্বিচারে গ্রেফতারসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর দ্বারা সংঘটিত গুরুতর অপরাধগুলোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারি বাহিনীগুলো জানুয়ারি

২০১৪-এর সাধারণ নির্বাচনের আগে ও পরে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। একই সময়ে বিরোধী দলগুলো অর্থনৈতিক অবরোধ প্রয়োগ এবং জানুয়ারির নির্বাচন বয়কটের লক্ষ্যে জনগণের ওপর সহিংস ও নির্বিচার আক্রমণে নিজেদের নিয়োজিত করে।

পর্যাপ্ত প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও, সরকার নির্বাচন সংক্রান্ত সহিংসতা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি নিশ্চিত করতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হলো, ২০১৪ সালের মে মাসে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব)-এর বেশ কয়েকজন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয় যারা একজন স্থানীয় রাজনীতিবিদের চুক্তিভিত্তিক (কন্ট্রাক্ট কিলিং) খুনের বহুল প্রচারিত ঘটনার সাথে যুক্ত ছিলেন।

হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ-এর এশিয়া ডিরেক্টর ব্র্যাড অ্যাডামস গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, র‍্যাবের কয়েকজন সদস্যের গ্রেফতারের বিষয়টি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ, কিন্তু সরকারকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, ন্যায়বিচার যাতে শুধুমাত্র তাদেরকেই দেয়া না হয় যাদের পারিবারিক বা রাজনৈতিক যোগাযোগ রয়েছে। যেখানে সরকারের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে সেখানে তারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে অবাধে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে এবং তাদের মাত্রাতিরিক্ত কাজকে অগ্রাহ্য করেছে। যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, বাংলাদেশে অনেকদিন ধরেই এই প্রবণতা চলছে।

এএফএডি ও ফোরাম এশিয়া'র উদ্বেগ

দ্য এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সস (এএফএডি) এবং এশিয়ান ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস্ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ফোরাম-এশিয়া) বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক অপহরণ-গুম এবং ক্রসফায়ারে হতাহতের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে একটি বিবৃতি প্রদান করে। নিরপেক্ষ, বিশ্বাসযোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আন্দোলনরত বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের অবরোধ-হরতাল কর্মসূচি চলাকালেই সংগঠনটির পক্ষ থেকে এই বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে।

বিবৃতিটিতে বলা হয়, চলমান রাজনৈতিক সহিংসতাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। বর্তমান রাজনৈতিক সংকট মূলত দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ঘণীভূত হয়েছে: প্রথমত, আওয়ামী নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটকে ৫ জানুয়ারি একটি রাজনৈতিক সভা করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এর কারণে ২০ দলীয় জোট লাগাতার অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচি আহ্বান করে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ৬ জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই অবরোধ-হরতাল কেন্দ্রিক সহিংসতায় ৪৯ জন মানুষ মারা যায়।

বিবৃতি মতে, ২৮ জানুয়ারি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'হরতাল ও অবরোধ চলাকালে জনগণের ওপর হামলা রোধে যখন যেখানে প্রয়োজন, যেকোনো ধরনের পদক্ষেপ নিন। আমি দায়িত্ব নিব'। কয়েকজন মন্ত্রী, ক্ষমতাসীন ১৪ দলীয় জোটের কয়েক নেতা, পুলিশ ও র‍্যাবের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তারা হামলা চালানোর সময় হামলাকারীদের দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশও দিয়েছেন। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এ ধরনের বক্তব্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক বিনাবিচারে হত্যা ও নির্যাতনের প্রবণতাকে উস্কে দিবে।

চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সরকারের এ ধরনের দমন-পীড়ন নীতি রাজনৈতিক সংকটের স্থায়ী সমাধানে অন্তরায় হিসেবে কাজ করবে। এজন্য এএফএডি ও ফোরাম এশিয়া উভয়পক্ষকেই সহনশীল হয়ে স্থায়ী সমাধানের পথ বের করার জন্য আহ্বান জানায়।

ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের মানবাধিকার উপ-কমিটির আয়োজনে একটি শুনানির আয়োজন করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে যাওয়া ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সংসদ সদস্য ইওসেফ ভাইডেনহলৎসার সেই শুনানিতে বলেছেন, বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি খুবই নাজুক। দুর্ভাগ্যবশত, পরিস্থিতি যেভাবে এগুচ্ছে তা নেতিবাচক। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সন্তোষজনক নয়। উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে মানবাধিকার উপ-কমিটির চেয়ারপারসন এলেনা ভ্যালেন্সিয়ানোর সভাপতিত্বে সেই শুনানিতে এভাবেই বাংলাদেশ সফরে ইইউ প্রতিনিধিদলের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন ইওসেফ। এতে আরও বক্তব্য রাখেন ইইউ প্রতিনিধিদলের আরেক সদস্য ক্যারোল কারস্কি ও ইউরোপিয়ান ইনটার্নাল অ্যাকশন সার্ভিসের (ইইএএস) টমাস নিকলসন।

ইওসেফ বলেন, ৫ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশজুড়ে সংঘাতে ৬০ জনের বেশি মারা গেছে। বিরোধীদলের ৭-১০ হাজার কর্মী গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ। তারা নতুন নির্বাচনের আহ্বান জানালেও সরকারের দাবি, তারা বৈধভাবে নির্বাচিত। এ দ্বন্দ্ব-

সংঘাত সমাধান করা কঠিন। উভয়পক্ষ তাদের অবস্থানে অনড়।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়াও আমরা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেছি। স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষকদের সঙ্গেও কথা বলেছি। ড. ইউনূসের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে সবার বক্তব্য হলো– সামনের সপ্তাহগুলোতে তেমন কিছু পরিবর্তন হবে না। আর সে কারণে উত্তেজনা বাড়তে পারে। যেটাই হোক না কেন, যে দিকেই যাক না কেন, পরিস্থিতি যদি এমন হয়ে যায় যেখানে বিরোধীদলকে কোণঠাসা করে দেওয়া হয়েছে, তাদের আর কোনো সম্পৃক্ততা নেই, যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে অন্য শক্তিগুলো সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের প্রসঙ্গ আসতে পারে। সেটাই একটা বড় ধরনের ঝুঁকি।

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের উদ্বেগ প্রকাশ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে ওয়াশিংটনের ফরেন প্রেস সেন্টারে এক ব্রিফিংয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিশা দেশাই বিসওয়াল। তার মতে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও সহিংসতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। তবে এ সংকট অভ্যন্তরীণভাবে সমাধান করতে হবে। বিরোধীদের জন্য রাজনৈতিক সুযোগ আর নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিরোধী জোটনেত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা প্রত্যাশা করি কোনো প্রকার অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে, কোনো প্রকার আইনি প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। তবে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য সক্ষম রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক সহিংসতার মাত্রা নিয়ে আমাদের ব্যাপক উদ্বেগ রয়েছে। সকল রাজনৈতিক দলের সহিংসতা পরিহার করা প্রয়োজন। একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো সরকারের পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সক্রিয় থাকার সুযোগ নিশ্চিত করা। আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশের মতো গণতান্ত্রিক একটি দেশে নাগরিক সমাজের জন্য স্পেস ও গণমাধ্যমের জন্য মৌলিক স্বাধীনতা থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অন্যদিকে, যুক্তরাজ্যের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকারের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন, এমন ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতারা বাংলাদেশে নিরাপত্তাহীন। 'কান্ট্রি ইনফরমেশন এন্ড গাইডেন্স, বাংলাদেশ : অপজিশন টু দ্য গভর্নমেন্ট' শীর্ষক প্রতিবেদনটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়। এ বছরের ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য অনুসারে প্রতিবেদনে বলা হয়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিরোধী রাজনীতিক ও নারীদের রক্ষা এবং সহিংসতা দমনে ব্যর্থ বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো দায়ভার ছাড়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে, নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করে। তারা গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে জড়িত।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, কারচুপির আশঙ্কায় বিএনপি দশম সংসদ নির্বাচন বর্জন করায় বর্তমান সংসদে দলটির কোনো আসন নেই। কিন্তু বিএনপিই এখনো প্রকৃতপক্ষে সরকারের প্রধান বিরোধী পক্ষ। এদিকে ওই নির্বাচনের বর্ষপূর্তিতে ঢাকায় সব ধরনের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয় এবং খালেদা জিয়াকে নিজ কার্যালয় থেকে বের হতে দেয়নি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সহিংসতায় ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত ২৭ জনের প্রাণহানি ঘটে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে যুক্তরাজ্যের প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকার ভিন্নমত এবং সমালোচনা সহ্য করে না, বরং এ বিষয়ে সরকার আক্রমণাত্মক। ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট (আইসিটি) ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এবং জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালার কারণে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়েছে।

অভিজিৎ রায় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় হিউম্যান রাইটস্ ফোরাম, বাংলাদেশ-এর উদ্বেগ প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মুক্তমনা ব্লগের লেখক ও সম্পাদক অভিজিৎ রায়কে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করে হিউম্যান রাইটস ফোরাম, বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)। এইচআরএফবি হচ্ছে ১৯টি মানবাধিকার সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত ফোরাম।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রাত সাড়ে আটটার দিকে কতিপয় দুষ্কৃতিকারীরা অভিজিৎ রায় ও তার স্ত্রী রাফিদা আহমেদ এর ওপর ধারালো চাপাতি দ্বারা হামলা চালায় এবং কুপিয়ে জখম করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১০টা নাগাদ অভিজিৎ রায় মৃত্যুবরণ করেন এবং তার স্ত্রী এখনো চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ফোরাম মনে করে, উক্ত ঘটনাস্থলের খুব কাছাকাছি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি সত্ত্বেও এ হামলা চালিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে পারা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর চরম ব্যর্থতা। উপরন্তু ঘটনার পর পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে না পারা কিংবা কারা এ ঘটনায় জড়িত তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারাটা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি অভিজিৎ হত্যাকারীদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। ফোরাম বিশ্বাস করে, এ ধরনের সহিংসতার বিষয়টিকে বিবেচনা করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সজাগ ভূমিকা রাখবে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সংকলন: *হোজ্জাতুল ইসলাম।*

পারিবারিক সহিংসতার উদ্বেগজনক পরিস্থিতি এবং আমাদের করণীয়

এস. এম. শরিফুল ইসলাম

সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রতিদিনই পারিবারিক সহিংসতার ভয়াবহ চিত্র উঠে আসছে। ২০১৪ সালের ১২ আগস্ট রাজধানীর ডেমরায় খুন হন পাথর ব্যবসায়ী কামরুল ইসলাম। নিজের মায়ের পরিকল্পনাতেই তিনি খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে। ১ সেপ্টেম্বর রাজধানীর বনানী ডিওএইচএস এলাকায় নিজ বাসায় এক শিল্পপতি ও তার স্ত্রীর লাশ পাওয়া যায়। পুলিশের তথ্য মতে, শিল্পপতি আবদুর রউফ তার স্ত্রী রোখসানা পারভীনকে গুলি করে হত্যার পর নিজে মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। ব্যবসায়িক মন্দা ও ঋণখেলাপি নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলছিল। পারিবারিক কলহের জেরে ২৬ সেপ্টেম্বর স্ত্রীকে খাটের সাথে বেঁধে রেখে সিলিং ফ্যানে ঝুলে আত্মহত্যা করেন মিরপুরের এক স্বামী। ৩ অক্টোবর সাতক্ষীরার আশাশুনির সরাপপুর গ্রামে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামীকে কুপিয়ে খুন করেন স্ত্রী। পরকীয়ায় বাধা দেওয়ায় এ ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশের ধারণা। ১০ অক্টোবর যাত্রাবাড়ীতে নৃশংসভাবে খুন হয় ছয় বছরের শিশু মায়মুনা। এ ঘটনায় তার সৎমা পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

চট্টগ্রামের রাউজানে পরকীয়ার অপরাধে স্বামীকে খুন করে গর্তে পুঁতে রাখে এক স্ত্রী। দ্বিতীয় বিয়ে করায় স্বামীকে হত্যা করে ওয়ার্ডরোবে লুকিয়ে রাখেন রাজধানীর কল্যাণপুরের এক নারী। গত ১৬ অক্টোবর আলাদা ঘটনায় এই দুই স্বামীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। একই দিন পারিবারিক মনোমালিন্যের জের ধরে নিজ ঘরে আত্মহত্যা করেন ধারাবাহিক নাটক *এইসব দিনরাত্রি*'র অভিনেত্রী টুনি। পরকীয়ার জের ধরে গত ১৯ অক্টোবর প্রেমিক ও প্রেমিকের বন্ধুদের সহযোগিতায় নিজ স্বামীকে খুন করেন মিরপুরের লাবণী ইয়াসমিন। পারিবারিক কলহের জের ধরে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের খবর প্রতিদিনই সংবাদপত্রে উঠে আসছে। দিন যত যাচ্ছে, এ ধরনের ঘটনার প্রবণতাও যেন ততই বাড়ছে!

উল্লিখিত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সামাজিক ও পারিবারিক পর্যায়ে অস্থিরতা চরম আকার ধারণ করেছে। এ কারণে একান্ত আপনজনই হয়ে উঠছে ঘাতক। দাম্পত্য ও পারিবারিক কোন্দল দ্রুতই গড়াচ্ছে সহিংসতার দিকে। হত্যাকাণ্ডের ধরনও পাল্টেছে। পারিবারিক বিরোধের শিকার বেশি হচ্ছে নারী ও শিশু। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে প্রতিদিনই রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের কোনো না কোনো স্থানে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।

পারিবারিক সহিংসতার কারণ সম্পর্কে পুলিশের সাবেক আইজিপি এ এস এম শাহজাহান গণমাধ্যমকে বলেন, পারিবারিক বন্ধন এমন দুর্বল হয়ে গেছে যে পারিবারিক অনুশাসন এখন আর কেউ মানতে চায় না। এ কারণে পারিবারিক সহিংসতা বাড়ছে। তিনি বলেন, এই বন্ধন সুদৃঢ় করতে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রকে কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে। একই সঙ্গে সবাইকে সচেতন হতে হবে। তিনি বলেন, পারিবারিক হত্যাকাণ্ড কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের সচেতন করার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মাদকাসক্ত সন্তান বাবা-মা বা ভাইবোনকে হত্যা করছে। মাদক নির্মূল করতে পারলে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। এ ছাড়া পারিবারিক ঘটনাগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে থানা-পুলিশ আমলে নিয়ে সমাধান বা আইনি ব্যবস্থার দারস্থ হতে হবে।

বিশিষ্ট কলামিস্ট ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ *দৈনিক মানবজমিন* পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, মানুষের মধ্যে নিষ্ঠুরতার প্রবণতা বেড়ে গেছে। মানুষের মন থেকে স্নেহ-মায়া-মমতা ও সুকুমার বৃত্তি লোপ পাচ্ছে। এ কারণে পারিবারিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। তিনি বলেন, ঘরের ভেতর প্রিয়জনের হাতেই আরেক প্রিয়জন যে হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে তার জন্য দায়ী আমাদের সমাজ। আমাদের সমাজই এই হত্যাকারীদের তৈরি করেছে। তাই যতদিন সমাজের চরিত্র পরিবর্তন না ঘটানো যাবে বা মূল্যবোধের পরিবর্তন না ঘটানো যাবে, ততদিন এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে। দেশে হাজার হাজার নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু কোথায় ঘটছে, কীভাবে ঘটছে- তা সহজে জানা যায় না। পারিবারিক সহিংসতাকে

নারীর প্রতি সহিংসতা: কারণ ও করণীয় অনুসন্ধান

মো. সাখাওয়াত হোসেন

নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি বিশ্বজুড়ে লক্ষ কোটি নারীর জন্য গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর প্রতি বৈষম্যের মাত্রা এতটা প্রকট যে নারীকে প্রতিটি ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হতে হয়। অবশ্য বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমঅধিকারের বিধানটি সমানভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৮(১) অনুচ্ছেদে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও লিঙ্গভেদে বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থানের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বৈষম্য ও নির্যাতন রোধে রাষ্ট্রীয় কোনো উদ্যোগ কাজে লাগছে না। নারীর প্রতি নির্যাতনের বিষয়টি পুরনো; কালের বিবর্তন এবং ঘটনার পরিক্রমায় নির্যাতনের মাত্রা ও ধরন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

বাংলাদেশে সাধারণত ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন, শারীরিক নির্যাতন, পাচার, পতিতাবৃত্তি, যৌতুক, মারাত্মক জখমসহ খুনের মতো জঘন্য অপরাধগুলো প্রতিনিয়তই ঘটছে, যা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য লজ্জার। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য দল-মত নির্বিশেষে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আশুপদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। নারী নির্যাতন ও সহিংসতার দিক থেকে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে নারীরা সমাজে পুরুষের অধীনে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সহিংসতার প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে থাকে (হাদি, ২০০৯)।

আপাতদৃষ্টে পরিবারই নারীর নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বিবেচিত হলেও সেখানে তারা সর্বদাই নানা ধরনের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন এবং বঞ্চনার শিকার হয়। সাধারণত নারীরা সমাজ ও পরিবারে তাদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে না, আবার পুরুষের সিদ্ধান্তের বাইরেও যেতে পারে না। অনেক আগে থেকেই নারীদেরকে একটা বিশেষ সামাজিকীকরণের মাধ্যমে পরাধীনতা মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত বিষয় বা পারিবারিক বিষয় বলে সমাজে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং বেশির ভাগ মানুষ মানতে রাজী নন যে এটি একটি অপরাধ। এ অবস্থায় পারিবারিক সহিংসতার প্রতিকার খুবই দুরূহ। আমাদের দেশের নারীরা সহজে অপমানের কথা প্রকাশ করেন না। সহিংসতার শিকার নারীরা নিরাপত্তা ও মান-সম্মানের ভয়ে মামলা করেন না। যতক্ষণ সহ্য করতে পারেন, ততক্ষণ মুখ বন্ধ রাখেন। ফলে সহিংসতার ঘটনাগুলো প্রকাশ না পাওয়ায় আইনের প্রচলন থাকলেও কোনো সুফল মিলছে না।

এক্ষেত্রে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশিদের। কোনো পরিবারে স্বামী-স্ত্রী বা অন্য সদস্যদের মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলমান থাকলে তা সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে যেন সেটি চূড়ান্ত কোনো পরিণতির কারণ না হয়। পাশের ঘরে বা পরিবারে পারিবারিক কলহ বা সহিংসতা নৈমিত্তিক ঘটনায় রূপ নিলে বিরোধীয় পক্ষদ্বয়কে পারিবারিক বৈঠকে বসে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে। এতেও কোনো সুরাহা না হলে স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে সাথে নিয়ে সালিশে বসে বিরোধ মীমাংসার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

আপোসের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করা না গেলে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন বা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আওতায় মামলা করা যেতে পারে। মামলা দায়ের করলেই যে অপরাধীকে বড় কোনো শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে- এমন নয়। যেহেতু পারিবারিক সহিংসতা আইনের মূল উদ্দেশ্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সুরক্ষা এবং পরিবারে বিচ্ছেদ না করে শান্তি ফিরিয়ে আনা, সুতরাং আদালত বিরোধীপক্ষকে সংশোধনের সুযোগ দেন, যা থেকে খুব সহজেই অপরাধী নিজের ভুল বুঝতে পারেন, অপরাধের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকেন।

এস. এম. শরিফুল ইসলাম : উন্নয়নকর্মী।

ইমেইল : smsarifsohag@gmail.com

নারীরা তাদের পরাধীনতা ভাঙ্গার চেষ্টা করলেও পুরুষের জোর-জবরদস্তির কাছে বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করলে একটি কার্যকর সম্পর্ক পাওয়া যায়। সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিষয়টি সমস্যায় পরিণত হয় এবং এর সাথে প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলোও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অধিকাংশ সমাজে লিঙ্গভেদে বৈষম্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পাওয়ায় নারীরা মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পরে (জামান, ১৯৯৯)। আমাদের দেশে এখনো অধিকাংশ নারী তাদের ভরণপোষণের জন্য সম্পূর্ণভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় নারীর উপর শুধু শারীরিক নয়, অর্থনৈতিক ও মানসিক নির্যাতনও নেমে আসছে।

নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি সারা বিশ্বে আলোচিত বিষয় হলেও উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে এ সমস্যা প্রকট। যদিও বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে এই মাত্রা কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ভারতে জাতীয় অপরাধ ব্যুরোর গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৮ সালে ৮১ হাজার ৩৪৪টি, ২০০৯ সালে ৮৯ হাজার ৫৪৬টি, ২০১০ সালে ৯৪ হাজার ৪১টি, ২০১১ সালে ৯৯ হাজার ১৩৫টি এবং ২০১২ সালে এক লক্ষ ছয় হাজার ৫২৭টি গৃহে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে, শ্রীলংকাতে ২০১২ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, শতকরা ৯৫ ভাগ নারী জীবনের কোনো না কোনো সময় যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নেপালে ২০১২ সালে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, শতকরা ৬৪ ভাগ নারী গৃহকর্তা কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়।

সময়ের সাথে সাথে সহিংসতার ধরনে ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে। পূর্বে সহিংসতা যেখানে শুধু পারিবারিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন সেটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলেও ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১১ সালে পরিচালিত (২০১৩ সালে প্রকাশিত) গবেষণায় দেখা যায়, শতকরা ৮৭ ভাগ বিবাহিত নারী তাদের স্বামী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়।

সহিংসতার ধরন ও পরিস্থিতি

বাংলাদেশে পুরুষ নারীর উপর প্রধানত শারীরিক, যৌন, মানসিক এবং অর্থনৈতিকভাবে নির্যাতন করে থাকে। আগে সাধারণত শারীরিক নির্যাতন করা হতো, সময়ের পরিবর্তনের সাথে নির্যাতনের ধরনও পাল্টেছে। শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে চড় মারা, কিল-ঘুষি মারা, চুল ধরে টানা, গরম ছ্যাঁক দেওয়া, এসিড নিক্ষেপ, শরীরে আগুন দেওয়া, ছুড়ি দেখিয়ে ভয় দেখানো, প্রহার করা, সজোরে ধাক্কা দেওয়া ও গলা টিপে ধরা ইত্যাদি। মানসিক নির্যাতনের মধ্যে বন্ধু, পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগে বাধাপ্রদান, অবিশ্বাস করা, হিজাব পড়তে বাধ্য করা, পড়াশোনা এবং চাকরিতে বাধাপ্রদান, বিনোদনের ব্যবস্থা না করা, পিতামাতার সম্পর্কে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করা এবং কন্যা সন্তান জন্ম দিলে দুর্ব্যবহার করা ইত্যাদি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যৌন মিলনে বাধ্য করা এবং মর্যাদাহানিকরভাবে অপরের সামনে উপস্থাপন করা ইত্যাদি হলো যৌন নির্যাতন।

অন্যদিকে, সংসারের খরচ দেওয়ার সময় অল্প পরিমাণে টাকা প্রদান, হাত খরচের জন্য টাকা না দেওয়া, যৌতুকের জন্য বারবার চাপ দেওয়া ইত্যাদি উপায়ে নারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে নির্যাতন করা হয়ে থাকে।

তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ইন্টারনেটের অপব্যবহারের কারণে 'পরকীয়া' নামক ব্যাধিটি বর্তমান সমাজে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। শহরের পাশাপাশি গ্রামেও এটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণেই পরকীয়া একটি সামাজিক ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। স্বামীর বিদেশ গমন, কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যস্ততা, সাংসারিক কলহ, বিনোদনের জন্য সময় না দেওয়া, অন্যের প্ররোচনা ইত্যাদি কারণে নারীরা পরকীয়ায় আসক্ত হচ্ছে। এভাবে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে এবং নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে পুরুষেরাও বাইরের মেয়ে ও নারীদের সাথে বাজে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের পরিবারে নারীদেরকে নির্যাতন করে। মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে মূলত অনৈতিক সম্পর্কের বিস্তার বেড়েছে। এছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের বিস্তর ব্যবধানের কারণে মনোমালিন্য তৈরি হয়, যার ফলে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হয় ও নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়।

মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে মূলত অনৈতিক সম্পর্কের বিস্তার বেড়েছে। এছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের বিস্তর ব্যবধানের কারণে মনোমালিন্য তৈরি হয়, যার ফলে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হয় ও নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়।

তাত্ত্বিকভাবে যদি আমরা নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি পর্যালোচনা করতে চাই, তাহলে দেখা যাবে, সহিংসতার সংস্কৃতির তত্ত্ব অনুযায়ী (culture of violence theory) পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রভাবশালী পুরুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল নারীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে থাকে। তাছাড়া, সহিংস সমাজে শান্তিপূর্ণ সমাজের তুলনায় পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। অন্যদিকে, সহকর্মীর প্ররোচনা ও পরিবেশ পরিস্থিতি মানুষকে সহিংস আচরণের দিকে

ধাবিত করে। মোদ্দা কথা হলো, সংস্কৃতির ক্রমধারায় নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি পুরুষ শাসিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক শিক্ষা (social learning) তত্ত্ব অনুযায়ী, দুটি বিষয়ে অলোকপাতের উপর নির্ভর করে পারিবারিক সহিংসতা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে উপাদান (ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, চাপ নেওয়ার ক্ষমতা, পরিবারের পূর্বঘটিত সহিংসতা) এবং অবস্থানগত উপাদান (অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান) ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে পরিবারে সহিংসতার মাত্রা, ধরন ও সংখ্যাগত পরিবর্তনের পরিমাণ বিবেচিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার জন্য প্রধানত দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক পরাধীনতা, নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাব, আইনের অপপ্রয়োগ এবং সম্প্রদায়ের সহিংসতাকে অন্যতম মুখ্য কারণ হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীর উপর স্বামীরা হরহামেশায় নির্যাতন করে থাকে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদও ঘটে থাকে।

তাছাড়া, কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরার পর স্বামীর সেবা করতে ব্যর্থ হওয়া এবং পরিবারের সামগ্রিক কাজ ঠিকভাবে সম্পাদনে অপারগ হলে নারীকে সহিংসতার সন্মুখীন হতে হয়। পারিবারিক সহিংসতার জন্য নারীর প্রতি অমানসিক নির্যাতনের কারণে নারী দুর্বল ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে সহিংসতার প্রকটতার কারণে নারী আত্মহত্যা করে থাকে। তাছাড়া, গর্ভকালীন সময়ে নির্যাতনের ফলে নারীর মৃত্যুও ঘটে। সামাজিকভাবে নির্যাতন ও অসম্মানের মুখোমুখি হতে হয় যা একজন নারীকে চরম বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়। কিন্তু বর্তমানে আশার কথা হচ্ছে, নারীরা বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনশীল কাজের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলছে। শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদেরকে যুক্ত করে সংসারের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে দেশের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে নারী সমাজ। আমাদের বৈদেশিক আয়ের সিংহভাগ আসে পোশাক শিল্প থেকে যার অধিকাংশ শ্রমিক নারী। নারীরা এখন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ডাক্তার, প্রকৌশলী, সরকারি চাকুরিজীবী, শিক্ষক, মানবাধিকারকর্মী প্রভৃতি পেশায় সুনামের সাথে কাজ করে চলেছে। তবে এখনো বাংলাদেশে অধিকাংশ নারী পারিবারিক শেঁকলে বন্দি জীবন যাপন করছেন।

নিজেদেরকে সভ্য ও উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে নারীদেরকেও সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে এগিয়ে নিতে হবে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন না করে, প্রতিদ্বন্দ্বি না ভেবে, সহযোগী ভাবার মতো উন্নত মানসিকতা ধারণ করতে পারলেই নারীর প্রতি সহিংসতা বহুলাংশে কমানো সম্ভব।

গ্রামে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রকট হওয়ার কারণে গ্রামের মানুষকে এ বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে সহিংসতার মাত্রা অনেকটা কমে যাবে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে করে সহিংসতা রোধে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও নীতি নির্ধারকদের এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে করে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানানো যায়। যৌতুক প্রথা ও বাল্যবিবাহ বন্ধে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এ ধরনের পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়নও নারীর প্রতি সহিংসতা লাঘবে উৎকৃষ্ট প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. জামান, হাবিবা (১৯৯৯)। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা: সমস্যা ও প্রতিবেদন।

২. হাদী, এস টি (২০০৯)। বাংলাদেশে পিতৃতান্ত্রিক ধারণা এবং অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ।

৩. সোনালী (১৯৯০)। শ্রীলংকায় পারিবারিক সহিংসতার কারণ এবং ঘটনাসমূহের তদন্ত।

৪. সাথী (১৯৯৭)। নেপালে নারী এবং মেয়ের প্রতি অবস্থানগত সহিংসতা।

৫. ভিসারা (২০০০)। ভারতে নারীর প্রতি সহিংসতা: গ্রাম্য পর্যবেক্ষণ।

মো. সাখাওয়াত হোসেন: শিক্ষার্থী, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।
ইমেইল: shakhawat.cps@gmail.com

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০ এর কার্যকর প্রয়োগ : স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

প্রসঙ্গ কথা

নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী অধিকারের চরম লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে মৌলিক অন্তরায় নারীর প্রতি সহিংসতা। নারী নির্যাতন রোধে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো তিন দশকের বেশি সময় ধরে সচেতনতামূলক প্রচার ও আন্দোলন চালাচ্ছে। ১৯৮১ সালে জাতিসংঘ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও সনদ) ঘোষিত হওয়ার পর নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়টি মানবাধিকার লংঘনের মৌলিক বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বিশ্ব জুড়ে দেশ ও কাল ভেদে নারী নির্যাতনের ধরন ও মাত্রার তারতম্য দেখা গেলেও নারীর প্রতি সহিংসতা একটি সার্বজনীন বাস্তবতা এবং তা নিরসনের জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল, ইউনিসেফের সাম্প্রতিক সময়ের তথ্য মতে, নারীরা অপরিচিত জনের হামলাকে যতটা না ভয় পায় তার চেয়ে বেশি ভয় পায় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রেমিকের হাতে প্রতিদিনের নির্যাতনকে।

বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতার পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। পারিবারিক সহিংসতাকে ব্যক্তিগত বিষয় বা পারিবারিক বিষয় বলে সমাজে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং বেশির ভাগ মানুষ মানতে রাজী নন যে এটি একটি অপরাধ। এ অবস্থায় পারিবারিক সহিংসতার প্রতিকার খুবই দুরূহ। নারীরা প্রতিনিয়ত পারিবারিক, যৌন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন; বিশেষ করে মানসিক নির্যাতন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, ৮১.৬ শতাংশ নারী গৃহে স্বামীর দ্বারা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন যা শারীরিক নির্যাতনের হারের চাইতেও বেশি। আমাদের পারিবারিক কাঠামো, সামাজিক প্রথা এবং আইনি ব্যবস্থায় মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধের কোনো সুযোগ নেই, যদিও এ ধরনের নির্যাতনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনেক সময় নারীর জীবনে শারীরিক নির্যাতনের চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতিকর।

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্র

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় Violence Against Women (VAW) Survey ২০১১ শিরোনামে দেশে প্রথমবারের মতো নারী নির্যাতন নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি জরিপ পরিচালনা করে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এই জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। জরিপের ফলাফলে নারী নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য: সারণি-১)।

২০১৩ সালেও এই চিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। পারিবারিক নির্যাতনের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা সারা দেশ জুড়ে বিরাজমান। বেসরকারি সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র এর সূত্রমতে, ২০১৩ সালে ৩৮৫ জন নারী পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এই তথ্য শুধুমাত্র পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের। (টেবিল-৩)

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রাসঙ্গিক আইন

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি আইন থাকলেও সুনির্দিষ্টভাবে পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে কোনো আইন ছিল না। যেখানে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নারীর ক্ষমতায়নের ইতিবাচক চিত্র আজ সর্বজনস্বীকৃত সেখানে নির্যাতন, সহিংসতা, ধর্ষণ ও ধর্ষণ পরবর্তী খুন, যৌতুকের বলি, রাস্তাঘাট ও স্কুল-কলেজে উত্ত্যক্তের শিকার, উত্ত্যক্ততা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় রূপ নিয়েছে। ধারণা করা হয়, নিজ পরিবারে নারীরা সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। কিন্তু নারী নির্যাতনের সরকারি জরিপে দেখা যায় উল্টো চিত্র, পরিবারেও স্বামী, শাশুড়ি, দেবর-ননদসহ অন্যান্য আপনজনের কাছে নারী ঝুঁকির মধ্যে থাকেন এবং নির্যাতনের শিকার হন।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৩৯টি মানবাধিকার ও নারী অধিকার বিষয়ক সংগঠনের উদ্যোগে গঠিত হয় পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে নাগরিক জোট। এই নাগরিক জোটের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার গত ১২ অক্টোবর ২০১০ তারিখে প্রণয়ন করেছেন পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০।

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে অন্যান্য যেসব আইন আছে সেগুলো মূলত শাস্তিনির্ভর। অর্থাৎ প্রতিপক্ষ বা অপরাধীকে জেল, জরিমানা ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু পারিবারিক সহিংসতা আইন-২০১০ এর মূল কথাই হচ্ছে প্রতিরোধ ও সুরক্ষা, অর্থাৎ পারিবারিক বাতাবরণে থেকেই পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আনা।

সারণি-১ : নারী নির্যাতন জরিপ- ২০১১ অনুযায়ী দেশে নারী নির্যাতনের চিত্র

ক্রম	নির্যাতনের ধরন	নির্যাতনের শতকরা হার (%)
১	নারী স্বামীর মাধ্যমে কোনো কোনো সময়, কোনো না কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার	৮৭%
২	মানসিক নির্যাতনের শিকার	৮১.৬%
৩	অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার	৫৩.২%
৪	যৌন নির্যাতনের শিকার	৩৬.৫%
৫	শারীরিক নির্যাতনের শিকার	৬৪.৬%
৬	ইচ্ছার বাইরে প্রথম দফায় যৌনতার শিকার	৯২.৬%
৭	নিজের ইচ্ছায় ভোট দিতে না পারা নারীর সংখ্যা	১৯.১%
৮	স্বামীর ঘরে নির্যাতনের শিকার	৮৭.৭%
৯	কর্মস্থলে বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের শিকার	১৬.২%

সূত্র: প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৪ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বরাত)

সারণি-২: নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণ

ক্রম	আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণ	শতকরা হার (%)
০১.	নারী স্বামীর ভয়ে আইনী ব্যবস্থা নেন না	৮.১%
০২.	নারী আইনি ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় মনে করেন	৪০.১%
০৩.	নারী সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা করেন	২০.৯%
০৪.	নারী নিজের সম্মান ও পরিবারের কথা চিন্তা করেন	১৬.৫%

সূত্র: প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৪ (নারী নির্যাতন জরিপ ২০১১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)

সারণি-৩ : ২০১৩ সালে পারিবারিক নির্যাতন (জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০১৩)

নির্যাতনের ধরন	বয়স (বছর)				মোট	মামলা
	০৭-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+		
স্বামীর দ্বারা নির্যাতন	-	০৬	০৪	২৪	৩৪	১৩
স্বামীর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নির্যাতন	০২	০২	০১	৭	১২	০২
স্বামী কর্তৃক হত্যা	০৪	৪৫	৬১	১০১	২১১	১২৬
স্বামীর পরিবারের সদস্য কর্তৃক হত্যা	০১	০৯	০৭	৩১	৪৮	৩৯
নিজ আত্মীয় কর্তৃক হত্যা	-	০২	০১	২৬	২৯	১৫
আত্মহত্যা	০৩	১৫	১২	২১	৫১	২৫
মোট	**১০**	**৭৯**	**৮৬**	**২১০**	**৩৮৫**	**২২৫ (৫৮.৪৪%)**

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০ এর সারসংক্ষেপ

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০ এর আইনের আওতায় পারিবারিক সহিংসতার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশু সুরক্ষা পাবেন। পারিবারিক সহিংসতা বলতে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে যেমন- রক্ত সম্পর্কীয়, বৈবাহিক সম্পর্কীয়, দত্তক বা যৌথ পরিবারের সদস্য এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিবারের অপর কোনো নারী বা শিশু সদস্যের উপর শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন অথবা আর্থিক ক্ষতিকে বুঝাবে।

অপরাধ ও শাস্তি

- এই আইনের অধীনে অপরাধসমূহ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য ও আপোষযোগ্য হবে।
- সুরক্ষা আদেশ ভঙ্গ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

সুরক্ষা আদেশ ভঙ্গের শাস্তি

- ১ম বার ভঙ্গ করলে: অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০(দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।
- অপরাধ পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে: অনধিক ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।

সমাজকল্যাণমূলক কাজে সেবা প্রদান

আদালত উপযুক্ত ক্ষেত্রে সুরক্ষা আদেশ ভঙ্গের জন্য শাস্তি প্রদান না করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিপক্ষকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে সেবাপ্রদানের আদেশ দিতে পারেন এবং বিষয়টি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে প্রদান করতে পারেন।

মিথ্যা আবেদন করার শাস্তি

এই আইনের অপব্যবহার করে কেউ যেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে আওতায় কাউকে হয়রানি করতে না পারে মিথ্যা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রয়েছে। এ ধরনের অপরাধের শাস্তি অনধিক ১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

আইনে নির্যাতনের ধরন	সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে প্রতিকার বা সেবাসমূহ	মামলার প্রক্রিয়া
১. শারীরিক নির্যাতন ২. মানসিক নির্যাতন ৩. যৌন নির্যাতন ৪. আর্থিক ক্ষতি	● অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা আদেশ ● সুরক্ষা আদেশ ● বসবাস আদেশ ● ক্ষতিপূরণ আদেশ ● নিরাপদ হেফাজত আদেশ।	● সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক আবেদনপত্র দাখিল ● আবেদনপত্রের উপর ভিত্তি করে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অন্তবর্তীকালীন সুরক্ষা আদেশ প্রদান ও নোটিশ প্রদান করবেন (৭ দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষকে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান) ● পক্ষসমূহের মধ্যে শুনানি হবে ● সুরক্ষা আদেশ প্রদান (নোটিশ প্রদানের ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে) ● আপিল করতে হবে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে এবং আপিল নিষ্পত্তি হবে ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে।

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০ এর পর্যালোচনা

এই আইনের আওতায় অপরাধসমূহকে আপোষযোগ্য বলা হয়েছে কারণ আইনের মূল লক্ষ্যই হলো পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ করা এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সুরক্ষা প্রদান করা যাতে করে পারিবারিক শান্তি বজায় থাকে। ২০১০ সালে আইনটি পাস হলেও এখন পর্যন্ত এটির প্রত্যাশিত সুফল মিলছে না। এর কারণ, আইনটি বাস্তবায়নে কিছু সমস্যা রয়েছে। যেমন- আইনটি নতুন হওয়ায় এবং প্রচারের অভাবে অধিকাংশ মানুষ এই আইন সম্পর্কে জানে না। আইনটি কেবল পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য, এ জন্য পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য কারও দ্বারা নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হলেও নির্যাতনকারীকে এই আইনের আওতায় আনা যায় না। এছাড়াও অর্থসংস্থানের অভাব এবং প্রয়োজনীয় জনবল ও আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার অভাবে আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার আর দশটি কাজের সঙ্গে এ কাজটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় এটিকে এনজিওদের বিষয় বলে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় অনেকের মধ্যে। আদালত, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রয়োগকারী কর্মকর্তাসহ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ সমন্বয়হীনতাও আইনটির সুফল না পাওয়ার অন্যতম কারণ।

দেশে হাজারো নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু কোথায় ঘটছে, কীভাবে ঘটছে- তা সহজে জানা যায় না। আমাদের দেশের নারীরা সহজে অপমানের কথা প্রকাশ করেন না। সহিংসতার শিকার নারীরা নিরাপত্তা ও মান-সম্মানের ভয়ে মামলা করেন না। যতক্ষণ সহ্য করতে পারেন, ততক্ষণ মুখ বন্ধ রাখেন। ফলে সহিংসতার ঘটনাগুলো প্রকাশ না পাওয়ায় আইনের প্রচলন থাকলেও কোনো সুফল মিলছে না। পারিবারিক সহিংসতার ঘটনার ক্ষেত্রে কী করতে হবে- অনেকেই তা জানেন না। অধিকাংশ এলাকায় এই আইনের আওতাধীন মামলাগুলো নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আওতায় চলে যায়। আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরো একটি বড় বাধা হচ্ছে, আইন প্রয়োগের প্রচলিত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা। আইনজীবীরা সাধারণত প্রতিপক্ষের সাজা নিশ্চিত করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এক্ষেত্রে আইনজীবীদের প্রচলিত এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

> একটি বড় বাধা হচ্ছে, আইন প্রয়োগের প্রচলিত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা। আইনজীবীরা সাধারণত প্রতিপক্ষের সাজা নিশ্চিত করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এক্ষেত্রে আইনজীবীদের প্রচলিত এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০ এর কার্যকর প্রয়োগে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও এর সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মানুষের ন্যায়বিচার ও বিভিন্ন ধরনের সেবাপ্রাপ্তির প্রাথমিক আশ্রয়স্থল হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী এবং তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সবচেয়ে কাছের প্রতিষ্ঠান, যেখানে মানুষ যেকোনো সময় যেকোনো প্রয়োজনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির দারস্থ হতে পারে, নিজেদের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার সমাধান চাইতে পারে।

নাগরিক উদ্যোগের কাজের অভিজ্ঞতায় প্রতীয়মান হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা বা যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা রোধে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। গ্রাম পর্যায়ে যখন কোনো নির্যাতন বা সহিংসতার ঘটনা ঘটে গ্রামের নির্যাতিত নারী বা পুরুষ সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান বা মেম্বারের কাছে ছুটে যান। এছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা চেয়ারম্যান বা মেম্বার সালিশের মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করেন, জটিল বিষয় মীমাংসা না হলে ভুক্তভোগী অনেক সময় আদালতের আশ্রয়

নেন। যদি কোনো নারী বা শিশু পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন)-২০১০ এর সাহায্যে মামলা করতে চায় সেক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ ভুক্তভোগী নারী ও শিশুকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে পারেন। তিনি স্বউদ্যোগে পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীকে প্রয়োজনে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠাতে পারেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার বেসরকারি সংস্থা যারা এ বিষয়ে কাজ করে তাদের সহযোগিতা নিতে পারেন।

ইউনিয়ন পরিষদের পারিবারিক বিরোধ নিরসন এবং নারী ও শিশু কল্যাণ কমিটির সদস্যগণ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনটি জনপ্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে এই কমিটির সদস্যগণ আরও যেসকল ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে সেগুলো হলো-

ক. ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্পে নারীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে তারা সহযোগিতা করতে পারেন।

খ. শিশু সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থে এবং শিশুশ্রম বন্ধে এলাকাবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

গ. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে পারেন।

ঘ. নারী ও শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতা প্রদান।

ঙ. নারী ও শিশুদের কল্যাণে কর্মসূচি গ্রহণ এবং নারী অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদকে আরও কার্যকর করা।

চ. পারিবারিক সহিংসতা রোধের বিষয়টি বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা করতে পারেন। পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি এবং আইনে যে শাস্তির বিধান রয়েছে সেই বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন ঘরে শান্তি স্থাপনের আইন। এই আইনের সহায়তায় স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষ নিজেদের মধ্যকার দূরত্ব মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। নারীর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরকেই প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে।

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে আমাদের করণীয়

- পারিবারিক সহিংসতাকে ব্যক্তিগত বিষয় নয়, বরং অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
- নারীর প্রতি নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা তৈরির জন্য স্কুলের পাঠ্যসূচীতে নারী-পুরুষ সম্পর্ক বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘরে বাইরে নারীর অবদান স্বীকার করে নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এই উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। এর পাশাপাশি নারী নির্যাতন প্রতিরোধে অন্যান্য যেসব আইন আছে সেসব আইনসমূহেরও কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, পারিবারিক সহিংসতা তথা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিকভাবে নারীকে সম্মানের চোখে দেখতে হবে, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে নির্যাতনকারীকে আইনের আওতায় আনতে হবে। একই সাথে সামাজিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে, নারীকে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে, তবেই প্রকৃতঅর্থে পারিবারিক সহিংসতামুক্ত শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। আমরা চাই নারী তার প্রাপ্য মর্যাদা নিয়ে বাঁচুক এবং পুরুষের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখুক। নারীর জন্য সুরক্ষিত থাকুক তার গৃহ, পরিবার ও সমাজ।

নোট:

[১] ৫-২৯ বছর বয়সের নারীরা ইচ্ছার বাইরে প্রথম দফায় যৌনতার শিকার হয় ৯২.৬% (৫-৯ বছর বয়সের ১.৭%, ১০-১৪ বছর বয়সের ৪১.৮%, ১৫-১৯ বছর বয়সের ৩৪.৩%, ২০-২৪ বছর বয়সের ৯.৯% ও ২৫-২৯ বয়সের নারী ৪.৯%।

(বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা নাগরিক উদ্যোগ-এর কর্মএলাকার উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপস্থাপিত নিবন্ধ।)

স্থানীয় বিরোধ মীমাংসায় সালিশ: একটি কার্যকর পদ্ধতি

রফিকুল ইসলাম ও হোজ্জাতুল ইসলাম

প্রসঙ্গ কথা

ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ মানবাধিকার রক্ষার অন্যতম উপায়। সাংবিধানিক গণতন্ত্রে ন্যায়বিচারের কাঠামোগত মৌলিক উৎস আদালত। আর ব্যক্তি পর্যায়ে ন্যায়বিচারের অন্যতম রক্ষক হলো আইন। কিন্তু বাংলাদেশে আইন ও আদালত ব্যবস্থা নানাবিধ দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি ও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আশানুরূপভাবে জনগণের নৈকট্য অর্জন করতে পারেনি। বরং স্থানীয় জনসাধারণ বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিজেদের সমাজে প্রচলিত সালিশ ব্যবস্থার দারস্থ হতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ঐতিহাসিককাল থেকেই বিরোধ মীমাংসায় সালিশ এ অঞ্চলে অতি জনপ্রিয় একটি প্রক্রিয়া যেখানে বিবাদমান পক্ষ, স্থানীয় গণ্যমান্য ও বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ মিলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অনেক সময় সালিশে পক্ষপাতিত্ব হয়, নারী ও দরিদ্ররা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। আপোসযোগ্য বিরোধসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে সমঝোতার ভিত্তিতে আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন সালিশদারদের মাধ্যমে মীমাংসার ক্ষেত্রে সালিশ যে কতটা কার্যকর একটি পদ্ধতি- সে বিষয়টিই আজকের এই সভায় আলোচনা করা হবে।

১. সালিশের আইনগত ভিত্তি

বিরোধ মীমাংসায় সালিশের ব্যবহার সংক্রান্ত বাংলাদেশে বেশ কিছু আইন প্রচলিত আছে। এ সকল আইনের মধ্যে একটি হলো দেওয়ানী কার্যবিধি (১৯০৮)। এই আইনের ৮৯ক ও ৮৯খ ধারা সালিশের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। এই বিধি অনুযায়ী, আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলার যেকোনো পর্যায়ে বাদী ও বিবাদী সালিশের মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসার জন্য বিচারকের প্রতি আবেদন দাখিল করতে পারেন। এই বিধির আওতায় বিচারকের নিজেরও অধিকার রয়েছে বিরোধটি সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করে দেওয়ার।

সালিশ নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরানো আইন হচ্ছে ১৯৩৭ সালের 'সালিশ (প্রটোকল ও কনভেনশন) আইন' এবং ১৯৪০ সালের সালিশ আইন। সর্বশেষ ২০০১ সালে নব আঙ্গিকে আরেকটি 'সালিশ আইন' (The Arbitration Act, 2001) তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে আমাদের বিচারব্যবস্থায় বহুল ব্যবহৃত ফৌজদারী কার্যবিধিতেও (ধারা ৩৪৫) 'অপরাধ'-এর আপোস মীমাংসার দিকনির্দেশনা রয়েছে। ৩৪৫ (১) ধারায় এমন কিছু অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আপোস করতে পারেন। যেমন- কাউকে মারধর করা, গৃহে বেআইনি প্রবেশ, ব্যভিচার, মানহানি। আবার ৩৪৫ (২) ধারায় এমন কিছু অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো আদালতের অনুমতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আপোস করতে পারেন। যেমন- বাসায় চুরি, বিশ্বাস ভঙ্গ, প্রতারণা, বহুবিবাহ ইত্যাদি।

এছাড়াও গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ (২০০৬) এর মাধ্যমেও কিছু দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান রাখা হয়েছে। এই অধ্যাদেশে অপরাধের দায়ে কাউকে সর্বোচ্চ ৭৫ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ (১৯৮৫) এর ১০ নং ধারায় বলা হয়েছে, পারিবারিক আদালত প্রথমে বিরোধীয় পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সমঝোতা করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে, আদালত বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে।

২. আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার সংকট

পশ্চিমা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আদলে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিন্তু এটি আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির পুরোপুরি উপযোগী নয়। পাশ্চাত্যের মডেল অনুসরণে এখানে এমন এক আইন ও বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা

হয়েছে যেখানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রবল। জনগণের প্রাত্যহিক সমস্যার প্রকৃতি বুঝে তার সমাধান দেওয়া এর মূল লক্ষ্য নয়। বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থায় এই অঞ্চলের সমাজ কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক, মানুষের বোধ-বিশ্বাস-প্রথা-রীতিনীতির দীর্ঘদিনের চর্চা ও বাস্তবতার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে না। এই ব্যবস্থায় আইনের আমলাতান্ত্রিক রীতি-নীতি মেনে চলা, দলিল-দস্তাবেজ-রেকর্ড ঠিক রাখা এবং আইনি পেশাজীবীদের নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চাকে এত বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় যে সাধারণ মানুষের পক্ষে এটিকে 'নিজস্ব' বা 'কাছের কিছু' বলে অনুধাবন করার মতো কোনো পরিস্থিতি থাকে না।

সাম্প্রতিক এক প্রকাশনায় একদল আইনজীবী সালিশ ও আনুষ্ঠানিক আদালতের মামলার মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন–

- সালিশে বিবাদমান পক্ষ নিজেদের ইচ্ছামতো মীমাংসার পথ খুঁজে বের করেন। অন্যদিকে মূলধারার আদালতে মামলায় বিচারক নিজ বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন;
- সালিশে উভয়পক্ষ নিজেদের জয়ী ভাবতে পারে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক আদালতের মামলায় একপক্ষকে হারিয়ে অন্যপক্ষ জয়লাভ করে;
- সালিশের মূল উদ্দেশ্য থাকে বিবাদমান পক্ষের মধ্যে স্থায়ী সমঝোতা সৃষ্টি করা। তাই সালিশের মাধ্যমে উভয়পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, মামলায় পক্ষগুলোর মধ্যে শুরু থেকেই শত্রুতা থাকে এবং মামলা শেষেও তা থেকে যেতে পারে;
- সালিশে অনেক কম সময়ে সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু মামলায় সময় লাগে কমপক্ষে ছয় মাস। অনেক সময় বছরের পর বছর বিচার চলে;
- সালিশে অর্থ ব্যয় হয় না বললেই চলে। কিন্তু মামলা চালাতে চালাতে অনেক সময়ই নিঃস্ব হয়ে পড়ে উভয়পক্ষ;

কেস স্টাডি-১

উত্তরাধিকার সম্পত্তি ফিরে পেল শাহানাজের পরিবার

মেহেন্দিগঞ্জের আলিমাবাদ ইউনিয়নের বাহেরচর গ্রামের শাহনাজ বেগম, তার বাবা ইসমাইল মাতব্বর ও তার ছোট বোন শারীরিকভাবে অক্ষম। বাবা হুইল চেয়ার ছাড়া চলাচল করতে পারেন না। বৃদ্ধা মা সংসারে কোনো কাজ করতে পারেন না। সংসারে একমাত্র উপার্জন করেন শাহনাজের বড় ভাই। তিনি একজন কোরআনের হাফেজ। তার ভাই ছোট একটি মক্তব পরিচালনা করেন। আর তাদের কিছু পৈত্রিক জমি ছিল। তা দিয়ে কোনোমতে সংসার চলে। সংসারের অভাব অনটন সহ্য করতে না পারায় শাহনাজকে বিয়ের বয়স না হলেও ছালাম সরদারের সাথে বিয়ে দেয়া হয়।

জমি থেকে সামান্য আয় দিয়েই শাহনাজের বাবার পরিবার শান্তিতে বসবাস করছিল। কিন্তু গত তিন/চার বছর ধরে তাদের পৈত্রিক জমি (৬৫ শতাংশ) জোর করে শাহনাজের চাচাতো ভাই শাহ আলম মাতব্বর, টুলু মাতব্বর ও মন্টু মাতব্বর ভোগ দখল করছে। এই জমি তাদের বলে তারা দাবি করে। শাহনাজের বাবাকে জমিতে কোনো ওয়ারিশের ভাগ দিতে অস্বীকার করে। শাহনাজের মতে, 'ওয়ারিশ সূত্রে আমরাই এই জমির আসল ভাগিদার। কাগজপত্রেও আমাদের নাম আছে। তারপরও আমরা প্রতিবন্ধী ও দুর্বল বলে জমি দিয়ে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে'। এর সুষ্ঠু বিচারের জন্য শাহনাজের পরিবার এলাকার লোকজনের দারস্থ হয়েছিল। প্রভাবশালীরা সমাধান করে দেবার আশ্বাস দিয়ে শাহনাজের পরিবার থেকে টাকা নিয়েছে, প্রতিপক্ষের নিকট থেকেও টাকা নিয়েছে। শাহনাজ বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ, বেশি টাকা দিতে পারি নি। প্রতিপক্ষ চাচাতো ভাই বেশি টাকা দিয়েছে; তাই এলাকার মাতব্বররা জমি আমার চাচাতো ভাই শাহ আলমকে দিয়ে দিয়েছে। আমরা অসহায় গরিব মানুষ, ন্যায়বিচারের জন্য মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছি কিন্তু কোনো বিচার পাই নাই'।

জমি হারিয়ে তারা খুব কষ্টে দিনযাপন করছিল। এমন সময় শাহনাজের বড় ভাই বরিশালে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণে একটি প্রশিক্ষণে গেলে সেখানে নাগরিক উদ্যোগের কর্মসূচি কর্মকর্তা শামিম আল মামুনের সঙ্গে পরিচয় হয়। তার নিকট থেকে শাহনাজের বড় ভাই নাগরিক উদ্যোগের বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা নিয়ে জানতে পারেন। এর পর শাহনাজ তার ইউনিয়নের নাগরিক উদ্যোগের কমিউনিটি মবিলাইজার এর নিকট অভিযোগ দেন। বিরোধের তথ্য অনুসন্ধান শেষে শ্রীপুরে নাগরিক উদ্যোগের আইনি সহায়তা কেন্দ্রে সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় প্রভাবশালীদের পূর্বের সিদ্ধান্তের সময় এই এলাকায় নাগরিক উদ্যোগের কার্যক্রম ছিল না।

প্রথম সালিশীতে কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়ায় পরে বিবাদী শাহ আলম মাতব্বরের বাড়িতে আবার সালিশের আয়োজন করা হয়। সালিশে জমির সব কাগজপত্র দেখে ওয়ারিশ সূত্রে জমির দাগ অনুযায়ী ৬৫ শতাংশ জমি শাহনাজের পরিবারকে ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ হলো, সংগঠিত সালিশ কার্যক্রম এবং আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে সেখান-কার মানুষের ধারণালাভ। এছাড়াও সালিশে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, জমি চাষাবাদের দায়িত্ব শাহ আলম মাতব্বর নেবে। আর ফসল যা হবে তা ভাগীদার হিসেবে ন্যায্য ভাগ শাহনাজের পরিবারকে বুঝিয়ে দিবে। সালিশ শেষে জমির কাগজপত্র অনুযায়ী সালিশদারগণ শাহনাজের পরিবারকে তাদের জমির দাগ নং ১২১ (খতিয়ান নং ৩৫৭) এ ২৮ শতাংশ, দাগ নং ২১৮ (খতিয়ান নং ৩৫৬) এ ২৭ শতাংশ ও দাগ নং ৩২০ (খতিয়ান নং ৩১২) এ ১০ শতাংশসহ মোট ৬৫ শতাংশ জমি আদায় করে দেয়। সালিশে সালিশদার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড সালিশ কমিটির সদস্য কাদের নলী, গাজী বশির আহমদ, ছিদ্দিক মল্লিক, সোবাহান তালুকদার, দুলাল বেপারীসহ আরও কয়েকজন।

জমি ফিরে পেয়ে শাহনাজ বলেন, 'আমারে নাগরিক উদ্যোগ যে সাহায্য করছে তা আমি কোনো দিনও ভুলুম না। এই রকম টাকা পয়সা ছাড়া সুবিচার পাইমু তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এলাকায় বইসাই দ্রুত এমন বিচার পাইয়া খুবই উপকার পাইছি। আমাগো এহানে সালিশীতে আগে ট্যাহা পয়সা খাইয়া ঠিকমতো সালিশ হইতো না, গরিবরা সঠিক বিচার পাইতো না। আপনাগো লাইগ্যা এহন আমার মতো সব অসহায় গরিব মানুষ ন্যায়বিচার পাইয়া ভালো মতো জীবন যাপন করতে পারবো'।

- মামলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় না। ফলে অনেকেই বিবাদিত বিষয় নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। সালিশ নিজস্ব পরিবেশে হয় বলে স্বাচ্ছন্দ্য থাকে। প্রয়োজনে সালিশে গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়;
- মামলায় শুধু বর্তমান সমস্যার সমাধান করা হয়। কিন্তু সালিশে সমস্যার পেছনের সমস্যাও খুঁজে দেখা হয়;
- মামলায় সাধারণত চলমান সমস্যার সমাধান করা হয় যান্ত্রিক ধাঁচে। সেখানে 'অপরাধ'-এর 'বিচার'ই মুখ্য। কোনো ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা থাকে না তাতে। অন্যদিকে সালিশে ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই সমাধান করা হয়;
- সালিশে যেহেতু পক্ষগণের মধ্য থেকেই সমাধানের পথ বের হয়ে আসে, সে কারণে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মামলায় বিচারকের কাছ থেকে সমাধান আসে বলে পক্ষগণের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির কোনো প্রশ্নই আসে না, মনোপুত না হলেও তারা কেবল সিদ্ধান্ত 'মেনে নেয়';
- মামলায় সাক্ষীরা যেহেতু বিচারকের পরিচিত নয়, সেকারণে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। কিন্তু সালিশে কমিউনিটির সবার সম্মুখে সে সুযোগ কম;
- মামলায় আইনের মারপ্যাঁচে কিংবা সাক্ষ্যগত জটিলতায় নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পেতে পারে। সালিশে তা হয় না;
- মামলার প্রক্রিয়া পক্ষগণের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সালিশের প্রক্রিয়া পক্ষরা নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের সুবিধাজনক সময় ও স্থানেই সালিশ বসে;
- মামলায় কাউকে অপরাধী করা হয় এবং প্রয়োজনে শাস্তি দেয়া হয়। সালিশে কাউকে অপরাধী করা হয় না এবং শাস্তি দেয়ারও বিধান নেই;
- মামলায় আইনের উপর জোর দেয়া হয়। কিন্তু প্রচলিত সালিশে জোর দেয়া হয় মূল্যবোধের উপর;

কেস স্টাডি-২

সংসার ফিরে পেলেন নলছিটির হাসি বেগম

পারিবারিকভাবে ষাট হাজার টাকা দেনমোহর ধার্য্য করে ৯ বছর আগে কুলকাঠি ইউনিয়নের কাফরকাঠী গ্রামের মোয়াজ্জেম হাওলাদারের ছেলে শাহিন হাওলাদার-এর সাথে কুশংগল ইউনিয়নের মানপাশা গ্রামের এস্কেন্দার আলী হাওলাদারের মেয়ে হাসি বেগমের বিয়ে হয়। তার ২টি সন্তান রয়েছে। ছেলের বয়স ৮ বছর ও মেয়ের বয়স ৪ বছর। তার স্বামী শাহিনের আয় কম। কোনো মতে চলছিল তাদের টানা-পোড়েনের সংসার। একপর্যায়ে হাসি বেগমের শ্বশুর তাকে বিদেশে পাঠাতে চায়। তিনি বিদেশে যেতে অস্বীকৃতি জানালে শুরু হয় পারিবারিক কলহ। একপর্যায়ে তাকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়াসহ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করলে তিনি তার একটি সন্তান নিয়ে বাবার বাড়ি চলে যান। পরে স্থানীয় ইউনিয়ন মেম্বারের কাছে অভিযোগ জানালেও তিনি কোনো সুফল পাননি। কুলকাঠি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তাদের মীমাংসা করে দিলেও শ্বশুর বাড়ির লোকজন বলে, 'চেয়ারম্যানেই তোর খাওন-পড়ন দেউক, আমরা দেতে পারমু না'। এমতাবস্থায় তিনি উভয় সংকটের মধ্যে তার বাবার বাড়িতে দিনযাপন করছিলেন। তার স্বামী কোনো ভরণপোষণ দিচ্ছিল না।

পরে হাসি বেগম কুশংগল ইউনিয়নের ওয়ার্ড সালিশ কমিটির সদস্য নাছিমা বেগমের কাছে নাগরিক উদ্যোগের এই প্রকল্প কার্যক্রমের খোঁজ পান। তিনি গত ১৯ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে ওয়ার্ড সালিশ কমিটির সভা চলাকালে কমিউনিটি মবিলাইজার সাদিয়ার কাছে অভিযোগ নিয়ে আসে। তার স্বামীর বাড়ি কুলকাঠি ইউনিয়নে হওয়ায় সাদিয়া কুলকাঠি ইউনিয়নের কমিউনিটি মবিলাইজার রায়হানের সাথে সমন্বয় করে বিষয়টি তদন্ত করেন। এরপর উভয়পক্ষকে নোটিশের মাধ্যমে নাগরিক উদ্যোগের নলছিটি অফিসে গত ১৯ ডিসেম্বর তারিখে সালিশ মীমাংসার জন্য ডাকা হয়। উক্ত সালিশে ওয়ার্ড সালিশ কমিটির সদস্যরা সমঝোতার ভিত্তিতে তাদের বিরোধ মীমাংসা করে দেন। ঐ দিনই হাসি বেগম তার স্বামীর বাড়ি চলে যান। বর্তমানে হাসি বেগম তার শ্বশুর বাড়িতে ২ সন্তান নিয়ে সবার সাথে বসবাস করছেন।

হাসি বেগম বলেন, 'আমি মেম্বার-চেয়ারম্যানের ধারে (কাছে) যাইয়া আমার সমস্যার কোনো সমাধান পাই নাই। আমার ভাইরা চাইছিল মামলা করতে। আমি নাগরিক উদ্যোগের খোঁজ পাইয়া সাদিয়া আফার ধারে অভিযোগ দেই। নাগরিক উদ্যোগ আমার সমস্যা মীমাংসা কইরা দেছে। বর্তমানে আমি আমার সন্তান লইয়া সুখে শান্তিতে স্বামীর ঘর করতে আছি'।

- আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান বলা হলেও প্রায়োগিক কারণেই মামলায় প্রভাবশালী ও ধনীপক্ষ অধিক সুবিধা পায়। সালিশে উভয়পক্ষকে আক্ষরিক অর্থেই সমানভাবে দেখা সম্ভব;
- সামাজিক সংহতি ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টিতে মামলার কোনো ভূমিকা থাকে না। কিন্তু সালিশে সেটাই বেশি গুরুত দেয়া হয়।

বিচার ব্যবস্থায় যে প্রক্রিয়ায় 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, নির্দিষ্ট সমাজের স্থানীয় বাস্তবতা ও সংস্কৃতিকে অনেকাংশেই তা স্বীকার করে না বা গুরুত্ব দেয় না। একটি সাধারণ ছাঁছের মধ্যে ফেলে সবকিছুকে বিবেচনা করার কারণে আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেওয়ার সুযোগ থাকে না।

মানুষ ন্যায়বিচারের আশায় প্রাতিষ্ঠানিক

বিচার ব্যবস্থার দারস্থ হতে উৎসাহ বোধ করে না। এ কারণে প্রান্তিক ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠী প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। মানুষ এই ব্যবস্থার দারস্থ হয় যতটা না সুবিচার পাওয়ার আশায়, তার চেয়ে বেশি প্রতিপক্ষের জন্য এক ধরনের ভোগান্তি তৈরি করতে। এদেশের বিচার ব্যবস্থা মানুষের সার্বিকভাবে ন্যায়বিচার প্রাপ্তি যতটা না নিশ্চিত করে, তার চেয়ে বরং অপরাধীদের সংশোধনে বেশি ভূমিকা রাখে। মানুষ একান্ত বাধ্য না হলে আইনি ব্যবস্থার দারস্থ হয় না। কিন্তু তার পরও বিপুল জনসংখ্যার এ দেশে মামলার কোনো কমতি নেই, যা আছে তা সামলাতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার নাকাল অবস্থা। এর সাথে যথাযথ সমন্বয়, যোগাযোগহীনতা ও আস্থাহীনতার কারণে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের তহবিলও অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে।

এভাবে নানাবিধ বাস্তবতার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা ও জনসাধারণের মধ্যে একটি বড় ব্যবধান গড়ে ওঠেছে, আর এর বিকল্প হিসেবেই মানুষ বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সালিশের দারস্থ হচ্ছে।

৩. সালিশ: শুধুই একটি মীমাংসা ব্যবস্থা নয়

সালিশেরও কিছু বিচ্যুতি রয়েছে। সালিশের নাম করে ফতোয়াবাজি, নিপীড়ন, নির্যাতন বা বঞ্চনার সংস্কৃতি সমাজে চালু রয়েছে। সমাজের ক্ষমতাশালী, পুঁজিপতি বা অবস্থান-মর্যাদায় যিনি সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান করেন, তার প্রতি পক্ষপাতের আশঙ্কা থাকে। অনেক সময়ই সালিশকে 'ফতোয়াবাজ', 'স্থানীয় ক্ষমতাশালী', 'গোঁড়া ধর্মতাত্ত্বিক' বা 'পিতৃতান্ত্রিক চর্চা' এর সহায়ক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ।

এসবের পরও সালিশই দরিদ্রবান্ধব ও প্রান্তিক মানুষের উপযোগী বলে প্রশংসিত হয় কীভাবে? কেন মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার তুলনায় সালিশের প্রতি বেশি আস্থাশীল? কেন তারা সালিশের মাধ্যমেই অধিকাংশ বিরোধ মীমাংসা করতে চায়? বিরোধ মীমাংসার এই অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে নিজেদের 'আপন' করে নেয়ার কারণ কী?

হ্যাঁ, বৈশিষ্ট্যগতভাবে সালিশ সমতাবাদী বা পুরোপুরি বৈষম্যহীন চর্চা নয়। কিন্তু সালিশ সমাজ, সংস্কৃতি ও স্থানীয় রীতিনীতির প্রতি সংবেদনশীল। সালিশ বহিরাগত নয়, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো ব্যবস্থাও নয়। এর আমলাতান্ত্রিক কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। সালিশ আনুষ্ঠানিক কোনো বিষয় নয়। মানবীয় সমাজ যদি আনুষ্ঠানিক না হয়, তবে মানুষের কল্যাণে সমাজে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর আনুষ্ঠানিক না হওয়াটা দোষের কি? আমাদের সমাজ অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়ার উপর ভিত্তিতেই কাজ করে থাকে।

সালিশ প্রক্রিয়া সমাজের মধ্যেই সংঘটিত হয়। বিবাদমান পক্ষ-বিপক্ষ সকলে এখানে কথা বলার সুযোগ পায়। সালিশে যে দীর্ঘ বিবরণ, দীর্ঘ শুনানি সেটি সমাজের সদস্যদের ক্ষমতায়িত ও মূল্যবান বোধ করার পরিসর দেয়। সালিশ বৈঠক নিজের চেনাজানা জায়গায় হয় যেখানে সহজে যাওয়া যায়। সালিশকারীর সাথে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। আমলাতান্ত্রিক ধাপ পার হবার ভোগান্তি ও বিপত্তি এখানে কম।

আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা যেখানে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষকে 'অজ্ঞ' হিসেবে চিহ্নিত

কেস স্টাডি-৩

স্বামীর কাছ থেকে দেনমোহর ও ভরণপোষণ পেলেন সায়েস্তাবাদের মোহছেনা

বরিশাল সদর উপজেলার সায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের বাসিন্দা মোহছেনা বেগম একজন গৃহিণী। স্বামী কামাল হাওলাদার, দুই মেয়ে জান্নাত ও মীমকে নিয়ে তার সংসার। প্রায়ই স্বামীর সাথে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হয়। গত ১২ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে আনুমানিক রাত ৯টায় মোহছেনা বেগমকে তার স্বামী চারিত্রিক অপবাদ দিয়ে গালিগালাজ ও মারধর করে। নাগরিক উদ্যোগের সহায়তায় সালিশের মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করা হলেও মোহছেনা বেগমের স্বামী কামাল হাওলাদার সালিশে উপস্থিত হয়নি। এজন্য বিষয়টির মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে মোহছেনা বেগম নিরুপায় হয়ে তার স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে পারিবারিক নির্যাতনের মামলা করেন। আদালত বিষয়টি বৈঠকে বসে মীমাংসা করার নির্দেশ দেন।

আদালতের নির্দেশের পর কামাল হাওলাদারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সালিশে উপস্থিত হতে রাজি হন। আয়োজিত সালিশে দুই পক্ষের প্রতিনিধি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ইউপি সদস্য এবং ওয়ার্ড সালিশ কমিটির সদস্যবৃন্দ। সালিশ বৈঠকে সাক্ষীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে ও উভয়পক্ষের মাঝে আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষে যেহেতু উভয়পক্ষই সংসার করতে আগ্রহী নয়, তাই তাদের তালাকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সালিশে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কামাল হাওলাদার মোহছেনা বেগমকে দেনমোহর বাবদ ৩০ হাজার টাকা, ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ বাবদ ১৫ হাজার টাকা এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ স্থানীয় ৩ শতাংশ জমির মূল্য এক লক্ষ ৮০ হাজার টাকাসহ মোট ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করবে, সন্তানদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে এবং উভয়পক্ষ আদালতে গিয়ে মামলটি প্রত্যাহার করবে।

পরবর্তীতে উভয়পক্ষ আদালতে গিয়ে মামলা প্রত্যাহার করেন। মোহছেনা বেগমের স্বামী কামাল হাওলাদার সালিশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করেন এবং তিনি সন্তানদের যাবতীয় ব্যয়ভার ও নিয়মিত বহন করছেন।

করে, বিপরীতে সালিশ তাকে গুরুত্ব দেয়, তার মৌলিক অস্তিত্বকে স্বীকার করে, তার বক্তব্য গুরুত্বসহকারে শোনে, তার রাগ-ক্ষোভের প্রকাশ দেখতে চায়, তার চিৎকার-চেঁচামেচি সহ্য করে। তাকে তার সমাজের মতো করে প্রকাশিত হবার সুযোগ দেয়।

কিন্তু সালিশেও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর বৈশিষ্ট্য ধারণের সুযোগ থাকে। ক্ষমতাবান পুরুষ প্রচলিত সালিশ প্রক্রিয়ায় বেশি দৃশ্যমান, সক্রিয় ও সোচ্চার। প্রথাগতভাবে এটি মূলত পুরুষের ফোরাম। সালিশকারগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত পুরুষ; সাধারণভাবে তারা সমাজের উচ্চ বংশের, অধিক বিত্তবান বা রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। নারীর প্রতি অবহেলা দেখানো যদি সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হয়, স্বাভাবিকভাবেই সালিশেও সেই বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে। এ জন্য সালিশে এ ধরনের চর্চা যতটা হ্রাস করা যায়- সে চেষ্টায় কাম্য।

৪. সালিশের মাধ্যমে স্থানীয় বিরোধ মীমাংসায় 'নাগরিক উদ্যোগ' এর কার্যক্রম

কোনো সালিশযোগ্য বিরোধ বা অপরাধ সংঘটিত হলে নাগরিক উদ্যোগ প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ বা পক্ষসমূহের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্যতা যাচাই করে। সত্যতা যাচাইয়ের পর নাগরিক উদ্যোগ উভয়পক্ষকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে বিবাদ মীমাংসার আহ্বান জানায়। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে সালিশ বৈঠকের স্থান নির্ধারিত হয়। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এলাকায় সালিশকারী হিসেবে পরিচিত ব্যক্তি এবং নাগরিক উদ্যোগ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সালিশকারীগণ সালিশ বৈঠকের আয়োজন করেন। নাগরিক উদ্যোগের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত থেকে সালিশকে আইনসম্মত ও গণতান্ত্রিক করতে তথ্য দিয়ে সহায়তা করে থাকেন। এছাড়া সালিশে কখনও কখনও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এবং এলাকার অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যেমন- কাজী, মসজিদের ইমাম, বিবাহ নিবন্ধনকারী উপস্থিত থাকেন। সালিশে উভয়পক্ষের সন্তুষ্টি এবং পূর্ণ সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তা লিপিবদ্ধ করা হয়। যদি কোনো অভিযোগ প্রথম সালিশবৈঠকে নিষ্পত্তি সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে পরবর্তীকালে আরও তিন বার সালিশ বৈঠক হয়।

এরপরও বিরোধ মীমাংসা না হলে অভিযোগকারীর ইচ্ছায় নাগরিক উদ্যোগ-এর প্যানেল আইনজীবীদের মাধ্যমে আদালতে মামলা করা হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তের পক্ষে পরিচালিত মামলার যাবতীয় আইনগত সহায়তা এবং ব্যয় নাগরিক উদ্যোগ বহন করে। উল্লেখ্য, সালিশ বিষয়ে আরও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাগরিক উদ্যোগ স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ার্ড সালিশ কমিটি, নাগরিক অধিকার দল, নারীনেতৃত্ব বিকাশ এবং স্থানীয়

কেস স্টাডি-৪

হিল্লা বিয়ের কবল থেকে রক্ষা পেল দুলাল-কিরণ

মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার চরপশ্চিম জাঙ্গালিয়া গ্রামের দুলাল গাজীর স্ত্রী কিরণ বেগমের প্রায়ই কথাকাটি হয়। ৫ বছরের সংসারে ছোট বিষয় কলহ লেগেই থাকে। একদিন কিরণ প্রতিবেশির কু বুদ্ধিতে বাপের বাড়ীতে চলে যায়। রাগের বসে দুলাল কিরণকে লিখিত তালাক দেয়। পরে দুলাল তার ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় স্ত্রীকে ঘরে তুলতে চায়। কিন্তু গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ঘরে তুলতে বাধা প্রদান করেন। তারা বলেন, তোমার স্ত্রীর সাথে তোমার তালাক হয়েছে। এখন তোমরা একসাথে বসবাস করতে পারবে না। যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে আবার ঘরে তুলতে চাও, তবে তাকে হিল্লা বিবাহ দিয়ে ঘরে তুলতে পারবে।

এই ঘটনার পরে দুলাল তার স্ত্রীকে নিয়ে বরিশাল সদর উপজেলার চরমোনাই ইউনিয়নে এক বন্ধুর বাড়ীতে পালিয়ে যায়। চরমোনাই গিয়ে তারা আবার বিবাহের চেষ্টা করলে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন সেখানকার এক প্রতিবেশী তাদের জানান যে, নাগরিক উদ্যোগ নামে এক প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত বিষয় নিয়ে এলাকায় কাজ করে। এ পর্যায়ে দুলাল নাগরিক উদ্যোগের কমিউনিটি মবিলাইজার মাকসুদা বেগম-এর নিকট গিয়ে বিষয়টি খুলে বলেন। কমিউনিটি মবিলাইজার ৮/৪/২০১৪ তারিখে অভিযোগ গ্রহণ করেন এবং সালিশ মীমাংশার জন্য ২১/৪/২০১৪ তারিখ দিন ধার্য করেন।

অভিযোগকারী ও এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে নাগরিক উদ্যোগের বরিশাল সদর উপজেলা অফিসে সালিশ বৈঠক বসে। সালিশকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড সালিশ কমিটির সদস্য জাকির হোসেন ও কামাল হোসেন এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মনির সিকদার, ফরহাদ হাং ও পিন্টু মিয়া। উভয়পক্ষের কথাবার্তা শুনে সালিশকারীগণ সিদ্ধান্ত দেন যে, যেহেতু তারা উভয়ে পুনরায় ঘর সংসার করতে চায়, সেহেতু তারা পুনরায় বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করে ঘর সংসার করতে পারবেন, তাতে কোন প্রকার বাধা নেই। সালিশকারীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ি দুলাল গাজী ও কিরন বেগম ওই দিনই নাগরিক উদ্যোগের কর্মসূচি কর্মকর্তা (আইন সহায়তা ও তদন্ত) এ্যাড. শামিম আল মামুন-এর সহযোগিতায় এক লক্ষ টাকা দেনমোহরে কাজীর মাধ্যমে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করেন। এ সময় নাগরিক উদ্যোগের কর্মীরা উভয়পক্ষকে ভবিষ্যতে ঝগড়া না করে মিলেমিশে বসবাস করতে পরামর্শ দেন। তারা উভয়ে এখন শান্তিতে বসবাস করছে।

দুলাল গাজী বলেন, রাগের মাথায় স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য আমি খুবই অনুতপ্ত। এখন থেকে সকলকে এই বিষয়ে বুঝাবেন যে রাগের মাথায় কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক নয়।

যুবকদের নিয়ে মতবিনিময় সভাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। নাগরিক উদ্যোগ সামাজিকভাবে স্বীকৃত সালিশ ব্যবস্থাকে গ্রামীণ জীবনের জন্য- বিশেষত নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বর্তমানে নাগরিক উদ্যোগ 'স্থানীয় পর্যায়ে আইনগত সেবার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা প্রকল্প' র আওতায় বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলার ৫টি উপজেলার ৫০টি ইউনিয়নে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসাসহ সার্বিক মানবাধিকার উন্নয়ন ও নারীর নেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা রাখছে। ২০১৩ সালের জুলাই মাস থেকে গত অক্টোবর, ২০১৪ পর্যন্ত ৫টি উপজেলায় মোট ১ হাজার ৫৯০টি বিরোধ স্থানীয় পর্যায়ে সালিশের মাধ্যমে মীমাংসায় সহযোগিতা করা হয়েছে। এর মধ্যে বরিশাল সদর উপজেলায় ৩৮৯টি, মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় ৪০৪টি, গৌরনদী উপজেলায় ২৩৬টি, ঝালকাঠি সদর উপজেলায় ৩০৫টি এবং নলছিটি উপজেলায় ২৫৬টি বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। এসব বিরোধ মীমাংসার মাধ্যমে ৩৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৯০ টাকা এবং ১ হাজার ৮২ ডেসিমেল জমি ভুক্তভোগীদেরকে আদায় করে দেওয়া হয়েছে।

৫. বিরোধ মীমাংসায় অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রম

স্থানীয় পর্যায়ের বিরোধ মীমাংসায় বিভিন্ন উন্নয়ন ও বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠন কাজ করছে। এগুলো মধ্যে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), মাদারীপুর লিগাল এইড এ্যাসোসিয়েশন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্রাক, বাঁচতে শেখা, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি উল্লেখযোগ্য। এসব সংগঠন সাধারণত দুই ধরনের সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। মাদারীপুর লিগাল এইড এ্যাসোসিয়েশন ও নাগরিক উদ্যোগসহ কিছু সংগঠন বিভিন্ন কমিউনিটির স্থানীয় সালিশদারদের নিয়ে দল গঠন করে তাদেরকে আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়। এর ফলে সালিশ কার্যক্রম যারা পরিচালনা করে থাকেন যেমন- স্থানীয় সালিশদার, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা কমিউনিটিতে বিরোধ মীমাংসার জন্য যথাযথভাবে সালিশ কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম হয়ে ওঠেন। পরে তাদের সমন্বয়ে গঠিত সালিশ কমিটি বিবাদমান পক্ষগুলোকে নিয়ে বসে বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। এক্ষেত্রে এসব সংগঠন সালিশের জন্য অভিযোগ গ্রহণ থেকে শুরু করে সালিশের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধকরণ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে থাকে। আবার আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্লাস্ট, ব্রাকসহ কিছু সংগঠন সালিশের জন্য অভিযোগ পাওয়ার পর নিজেরাই প্যানেল আইনজীবীগণের মাধ্যমে বিবাদমান পক্ষগুলোর সাথে বসে বিরোধের মীমাংসা করে দেয়।

৬. সালিশ, নারীর নেতৃত্ব বিকাশ ও ক্ষমতায়ন

সালিশে প্রায় একচেটিয়াভাবে মতামত প্রদানকারীর ভূমিকায় থাকেন পুরুষরা। সালিশকারের ভূমিকায় নারীকে প্রায় দেখাই যায় না। এই সমস্যা এ দেশের আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থায়ও রয়েছে। এমনকি বিপুল 'আধুনিকায়ন' এর পরও বাংলাদেশের বিচার কাঠামোতে নারীদের উপস্থিতি খুবই কম। এ জন্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন চর্চায় নারীর ক্ষমতায়নের পুনর্ধারণায় প্রয়োজন। ঘর-গৃহস্থালি, পরিবার-সমাজে নারীর গুরুত্ব এখনও পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। সামাজিক পরিসর, নিজেদের কমিউনিটি ও রাষ্ট্রে নারীর একক ও যৌথ সক্রিয়তার প্রতি আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

সালিশকে দেখতে হবে অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার সম্পূরক হিসেবে। সালিশে নারীর প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে, নারী পুরুষ উভয়ের কথা গুরুত্বের সাথে শুনতে হবে, নারীর নিপীড়িত ও শোষিত হবার মতো বিশেষ পরিস্থিতি যে পরিবার ও সমাজে এখনও রয়েছে- সেটি বিবেচনায় নিতে হবে। সর্বোপরি, প্রান্তিক মানুষজন ও বঞ্চিত-শোষিত নারী কেবল বিচারপ্রার্থী হবে না, তারাও ক্রমশ সক্রিয় সালিশদার হয়ে উঠবেন, সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এই প্রত্যাশা পূরণের জন্য উন্নয়ন সংস্থা, তৃণমূলের সংগঠন বা নাগরিক সমাজের পক্ষে কাজ করা সম্ভব বলেই মাঠপর্যায়ে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হয়েছে। একই পরিসরের উন্নয়ন সংস্থাগুলো তাদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সালিশ প্রক্রিয়ার পুনর্গঠনে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

উপসংহার

আমাদের মনে রাখতে হবে, উন্নয়নবাদী কার্যক্রম ও ঐতিহ্যবাহী চর্চার সম্মিলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বড় একটি চ্যালেঞ্জ। উন্নয়নবাদও বৈশিষ্ট্যগতভাবে পশ্চিমা মূল্যবোধ ও আনুষ্ঠানিকতার তাগিদকে ধারণ করে। সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীল থেকে সেখানে রূপান্তর ঘটানো অত্যন্ত দুরূহ প্রচেষ্টা। আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার সমস্যা রয়েছে। তবে সালিশকেও প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণের সুযোগ নেই। প্রয়োজন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা- এই দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান ও চর্চার সংস্কারে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। সালিশের সুবিধা হলো এটি স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয় এবং নির্দিষ্ট সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন এতে ঘটে। এই স্থানিকতা ও সুনির্দিষ্টতার সুবিধার জন্য সালিশকে সংস্কার করা বা এর নেতিবাচক দিকসমূহের অবসান ঘটানো সহজ হতে পারে।

(১৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপিত নিবন্ধ।)

রফিকুল ইসলাম : সহযোগী অধ্যাপক, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল : rislampacs@gmail.com

হোজ্জাতুল ইসলাম : মানবাধিকারকর্মী। ইমেইল : hozza.shomoy@gmail.com

খাদ্য অধিকারের আইনি স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

কামরুন্নেসা নাজলী

খাদ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনার শুরুতে বহুল ব্যবহৃত প্রপঞ্চ খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কেও ধারণাগত স্পষ্টতার প্রয়োজন রয়েছে। খাদ্য অধিকার ও খাদ্য নিরাপত্তাকে অনেক সময় সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করলেও এই দুটি ধারণার মধ্যে উৎপত্তিগত ও ব্যবহারিক দিক থেকে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা একটি নীতিগত ধারণা এবং খাদ্য নিরাপত্তা বলতে সামষ্টিক পর্যায়ে ক্রমবর্দ্ধমান খাদ্য চাহিদা পূরণে খাদ্য উৎপাদন, যোগান ও সরবরাহ, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে খাদ্যের প্রাপ্যতাকে নিশ্চিত করার কথা বুঝানো হয়। অন্যদিকে, খাদ্য অধিকার বলতে ব্যক্তি পর্যায়ের ক্ষুধা থেকে মুক্তি ও পুষ্টিমান সম্পন্ন পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের নিশ্চয়তাকে বুঝায় যা শুধু একক অর্থে ব্যক্তির খাদ্য নিরাপত্তা নয়, বরং ব্যক্তির ও তার পরিবারের মর্যাদাপূর্ণ জীবনধারণের নিশ্চয়তার সাথে যুক্ত। খাদ্য অধিকার একটি আইনগত ধারণা এবং অধিকার অর্থে শুধু নীতিগত লক্ষ্য নয়, বরং ব্যক্তির অধিকার পূরণে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা ও অধিকার লঙ্ঘনের যথাযথ প্রতিকার পাওয়ার বিষয়টি খাদ্য অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

আইনগত ধারণা হিসেবে সর্বপ্রথম সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে (১৯৪৮) খাদ্য অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ১১নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে খাদ্য অধিকারকে বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ চুক্তি কমিটির ১২নং সাধারণ মন্তব্য অনুসারে পর্যাপ্ত খাদ্য অধিকার তখনই বাস্তবায়িত হয় যখন প্রত্যেক নারী, পুরুষ ও শিশুর একা বা সমাজের অন্যদের সাথে একত্রিতভাবে সর্বাবস্থায় পর্যাপ্ত খাদ্যে বাস্তব বা অর্থনৈতিক প্রবেশগম্যতা বা পর্যাপ্ত খাদ্য ক্রয় করার আর্থিক সামর্থ্য থাকে।

খাদ্য অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের প্রথম বিশেষ প্রতিবেদক Jean Ziegler খাদ্য অধিকারের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'ব্যক্তি ও সমষ্টির শারীরিক ও মানসিক পরিপূর্ণতা ও মর্যাদাপূর্ণ নির্ভয় জীবনের নিশ্চয়তার জন্য সরাসরি অথবা আর্থিক ক্রয়ের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, পরিমাণ ও গুণগতভাবে পর্যাপ্ত খাদ্যে নিয়মিত, স্থায়ী ও অবাধ প্রবেশগম্যতা হচ্ছে খাদ্য অধিকার'। খাদ্য অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের আরেক বিশেষ প্রতিবেদক Olivier De Schutter খাদ্য অধিকার বিষয়ে বলেছেন, 'প্রাথমিকভাবে খাদ্য অধিকার বলতে জরুরি অবস্থায় খাদ্যের যোগান বোঝায় না। আইনি কাঠামো ও কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার অধিকার বুঝায়'। মোদ্দা কথা হচ্ছে, খাদ্য অধিকার কোনো দান বা অনুগ্রহের বিষয় নয়, বরং মর্যাদার সাথে সকল মানুষের নিজেদের খাদ্যের সংস্থান করার সামর্থ্য অর্জনের নিশ্চয়তাই হচ্ছে খাদ্য অধিকারের মূল বিষয়।

পর্যাপ্ত খাদ্য অধিকারের বিষয়টি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রের এখতিয়ারভুক্ত প্রত্যেকের ক্ষুধা থেকে মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য নিরাপদ, পুষ্টি বিবেচনায় পর্যাপ্ত, সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্যে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে নাগরিকের জন্য খাদ্যের প্রবেশগম্যতা অর্জনে সহায়তা করা, পর্যাপ্ত খাদ্যের প্রবেশগম্যতার বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করা, এবং অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেন কোনো ব্যক্তিকে তার খাদ্য অধিকারের প্রবেশগম্যতা থেকে বঞ্চিত করতে না পারে তার নিশ্চয়তা প্রদান।

প্রাসঙ্গিকভাবেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো খাদ্য অধিকার পূরণের সহায়ক হিসেবে জনগণের জীবিকা নির্বাহের উপায় নিশ্চিত করা এবং সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারে জনগণের প্রবেশগম্যতা শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা। তাছাড়া যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণে নিজেরা খাদ্যের সংস্থান করতে অসমর্থ হয়, রাষ্ট্রের উপর তখন ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য সরাসরি খাদ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব বর্তায়।

শুধুমাত্র সাংবিধানিক অন্তর্ভুক্তিই খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নের সমন্বিত উদ্যোগকে নিশ্চিত করে না এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় খাদ্য অধিকারকে অগ্রসর করতে ফ্রেমওয়ার্ক আইন বা খাতভিত্তিক আইনের মতো বাস্তবায়নকারী সম্পূরক আইন।

এই দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য ব্যবস্থার সব দিক যেমন, খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বণ্টন, বাজারজাতকরণ, নিরাপদ খাদ্য ভোগসহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকরি ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও মানদণ্ড ঠিক করার সুপারিশ করেছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ চুক্তি কমিটি। খাদ্য অধিকার সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে আইনি কাঠামো প্রণয়ন ও খাদ্য অধিকারের গ্রহণযোগ্যতাকে রাষ্ট্রীয় আইনি ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে খাদ্য অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করেছে এই কমিটি।

খাদ্য অধিকার বিষয়ে রাষ্ট্রের এই বাধ্যবাধকতাগুলোকে ২০০৪ সালে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত খাদ্য অধিকার বিষয়ক গাইড লাইনের মাধ্যমে পুনর্বার অনুমোদন করা হয়। এ স্বেচ্ছামূলক নির্দেশনায় (গাইড লাইন ৭) খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহের আইনি ও জবাবদিহিতার কাঠামো শক্তিশালী করার সুপারিশ করা হয়েছে।

জাতিসংঘসহ খাদ্য অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বিভিন্ন গবেষণা থেকে খাদ্য অধিকারের আইনি কাঠামো বিষয়ে মূলত তিন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়। প্রথমত: খাদ্য অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত: খাদ্য অধিকার বিষয়ে ফ্রেমওয়ার্ক আইন প্রণয়ন, এবং তৃতীয়ত: খাদ্য অধিকার পূরণে সহায়ক বিষয়ভিত্তিক/খাতভিত্তিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে খাদ্য অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি সবচেয়ে শক্তিশালী আইনি সুরক্ষা বটে। তবে, শুধুমাত্র সাংবিধানিক অন্তর্ভুক্তিই খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নের সমন্বিত উদ্যোগকে নিশ্চিত করে না এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় খাদ্য অধিকারকে অগ্রসর করতে ফ্রেমওয়ার্ক আইন বা খাতভিত্তিক আইনের মতো বাস্তবায়নকারী সম্পূরক আইন।

সাংবিধানিক সুরক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, কোনো কোনো রাষ্ট্র যেমন, বেলারুশ, বলিভিয়া, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, মিশর, দক্ষিণ আফিকা সরাসরি খাদ্য অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আবার কোনো কোনো রাষ্ট্র যেমন, আলজেরিয়া, কিউবা, বেলজিয়াম, স্পেন, নেদারল্যান্ডস ও থাইল্যান্ড মানবাধিকারের বৃহত্তর পরিসর বিবেচনায় পরোক্ষভাবে খাদ্য অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো রাষ্ট্র সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সরাসরি খাদ্য অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যেমন, বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে খাদ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করার জন্য পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো রাষ্ট্রে মানবাধিকারের বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে খাদ্য অধিকারের পরোক্ষ স্বীকৃতি দিয়ে থাকে।

অন্যদিকে, খাদ্য অধিকারকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে কাঠামো আইনের মাধ্যমে খাদ্য অধিকার বিষয়ক সাধারণ নীতিমালা ও দায় দায়িত্বের ব্যাখ্যার মাধ্যমে খাদ্য অধিকার বিষয়ক আইন বাস্তবায়নের পথ নির্দেশনা দেয়। যেহেতু খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও খাদ্য অধিকার প্রকৃতিগতভাবেই বহুমাত্রিক, তাই সংশ্লিষ্ট খাতভিত্তিক বিভিন্ন পক্ষের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে সমন্বিত নির্দেশনার জন্য ফ্রেমওয়ার্ক আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফ্রেমওয়ার্ক আইনের মাধ্যমে খাদ্য অধিকারের ব্যাপ্তি, রাষ্ট্র ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বাধ্যবাধকতার বর্ণনা, বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের প্রতিকারের ব্যবস্থা, আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি এবং সহায়ক বিভিন্ন আইন প্রণয়নের আইনি ভিত্তি তৈরি করা হয়। খাদ্য অধিকারের নির্দেশনামূলক (normative) বিধান তৈরি ও বলবৎকরণের জন্য প্রশাসনিক, বিচারবিভাগীয় ও আধা-বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার জন্য ফ্রেমওয়ার্ক আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

গত দশ বছরে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক রাষ্ট্র যেমন, ব্রাজিল, বলিভিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা খাদ্য অধিকার বিষয়ে কাঠামো আইন প্রণয়ন করেছে। উল্লেখ্য, মাল্টি স্টেকহোল্ডার দৃষ্টিভঙ্গি ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ ফ্রেমওয়ার্ক আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

খাদ্য অধিকারের বহুমাত্রিক দিকের কারণেই ইস্যুভিত্তিক বিভিন্ন আইন যেমন, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদে প্রবেশগম্যতা ও ব্যবহার সংক্রান্ত আইন, খাদ্য সংস্থান করার সামর্থ্য, ও কৃষকদের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার বিষয় নির্ধারণকারী বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন, কৃষি, শ্রম ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন খাদ্য অধিকার অর্জনে ভূমিকা রাখে। যেমন, ভারতের খাদ্য ভর্তুকি সংক্রান্ত জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন ২০১৩, পেরুর শিশু ও কিশোরদের

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সংক্রান্ত আইন ২০১৩, এবং বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ ইত্যাদি।

তাছাড়া, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৫৬, খাদ্যশস্য সরবরাহ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ১৯৭৯, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯, কৃষি উপকরণ (সরবরাহ ও সেবা) কর্পোরেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ১৯৭৬, কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৬৪ (সংশোধিত ১৯৮৫), কৃষি শ্রমিক (ন্যূনতম মজুরি) অধ্যাদেশ ১৯৮৪, মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০, গবাদি পশু আমদানী আইন ১৮৯৮, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন ১৯৭৩, ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ ইত্যাদি খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত।

খাদ্য অধিকার বিষয়ে বাংলাদেশের আইন-নীতি কাঠামোর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ বিভিন্ন মৌলিক মানবাধিকার চুক্তির অনুমোদনকারী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ তার জনগণের জন্য খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ক বাধ্যবাধকতা ছাড়াও জাতিসংঘ ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সহস্রাব্দ ঘোষণা এবং বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনের ঘোষণার অধীনে নাগরিকের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে খাদ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে খাদ্য অধিকার বাংলাদেশে মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত নয় এবং সরাসরি খাদ্য অধিকারকে আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করা যায় না।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রগতি লাভ করলেও সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সন্তোষজনক অগ্রগতি লাভ করে নি। এখনও বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্থায়ীভাবে গুণগত ও পরিমাণগত পর্যাপ্ত খাদ্যে প্রবেশগম্যতা নেই। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে খাদ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে খাদ্য অধিকার বাংলাদেশে মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত নয় এবং সরাসরি খাদ্য অধিকারকে আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করা যায় না।

২০১২-তেও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত ওয়েলফেয়ার মনিটরিং সার্ভেতে (২০০৯) ৩৯.৮% শতাংশ জনগোষ্ঠী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় বসবাস করে বলে অভিমত ব্যক্ত করে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে জাতীয় খাদ্যনীতি-২০০৬, জাতীয় খাদ্যনীতি ও পরিকল্পনাসূচি (২০০৮-২০১৫), কৃষিখাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনার সমন্বয়ে খাদ্যনীতি কাঠামো রয়েছে। পাশাপাশি, খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য নীতি এবং কর্মসূচী যেমন, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০১০-২০১২ (perspective plan), ভিশন-২০২১, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও (২০১১-২০১৫) প্রতিফলিত হয়েছে ।

তবে, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার আলোকে প্রণীত এইসব নীতি বাস্তবায়নের কোনো আইনি কাঠামো বাংলাদেশে নেই। ফলে নীতি বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততা যেমন নেই, নেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও। সমন্বিত আইনি কাঠামো না থাকা ও বিদ্যমান বিভিন্ন আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন না থাকার কারণেই বাংলাদেশের খাদ্য অধিকার অর্জনের পথের প্রধান সমস্যা যেমন, কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতার অভাব, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাজারে প্রবেশগম্যতার অভাব, অদক্ষ সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, নারীর ভূমি মালিকানার অভাব, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত হুমকি, জবাবদিহিতার অভাব ইত্যাদি থেকে উত্তরণ সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া, আন্তঃসম্পর্কিত নীতিগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও নীতি-কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতাও এর সাথে সম্পর্কিত।

এ প্রেক্ষাপটে খাদ্য অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠন ও নেটওয়ার্কের পক্ষে খাদ্য অধিকারের আইনি স্বীকৃতির দাবি ক্রমশই জোরালো হচ্ছে। খাদ্য অধিকারের আইনি স্বীকৃতির মধ্যে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে খাদ্য অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি ছাড়াও অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে খাদ্য অধিকার বিষয়ে ফ্রেমওয়ার্ক আইন প্রণয়নের দাবিও রয়েছে। তাছাড়া সম্পূরক ইস্যুভিত্তিক যেমন, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা সংক্রান্ত আইন, সামাজিক সুরক্ষা আইনের কথাও বলা হচ্ছে।

সর্বোচ্চ আইনি সুরক্ষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে, বাংলাদেশের বাস্তবতা ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাথমিক পর্যায়ে খাদ্য অধিকারের ব্যাপ্তি, সরকার, আন্তঃসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা সুনির্দিষ্ট করে জনঅংশগ্রহণ, বৈষম্যহীনতা, সমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ইত্যাদি মানবাধিকার নীতির আলোকে ও যথাযথ প্রতিকারের বিধান করে খাদ্য অধিকার বিষয়ে খাদ্য অধিকারের আইনি স্বীকৃতির আইন প্রণয়ন দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খাদ্য অধিকার অর্জনের পথকে সহজ করবে। এই ফ্রেমওয়ার্ক আইনের আওতায় খাদ্য অধিকারের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যমান খাতভিত্তিক বিভিন্ন আইনের সংশোধন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনারও সুযোগ থাকবে।

কামরুন্নেসা নাজলী: উন্নয়নকর্মী।
ইমেইল: QNazly@oxfam.org.uk

শিক্ষা অধিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশের দলিত জনগোষ্ঠী

মাজহারুল ইসলাম ও আফসানা বিনতে আমিন

বাংলাদেশ সমসাময়িক যেসব ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তার মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। বাংলাদেশ এখন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ২ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের দ্বার প্রান্তে ৯৮.৭ (২০১১) যার মধ্যে কন্যাশিশু ৯৯.৪ ভাগ ও ছেলেশিশু ৯৭.২ ভাগ (লক্ষ্য ১০০ ভাগ)। এছাড়া, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জেন্ডার বৈষম্যও ইতোমধ্যে দূর হয়েছে। এ রকম জাতীয় অর্জনের সাথে যদি দলিতদের শিক্ষা চিত্র দেখা যায়, তাহলে আমাদের হতাশ হতে হয়। কারণ বাংলাদেশে যেসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এখনো শিক্ষায় পিছিয়ে তার মধ্যে দলিতরা রয়েছে সর্বাগ্রে। দলিতদের জন্য আলাদা কোনো জাতীয়ভিত্তিক শুমারি বা জরিপ না থাকলেও সাম্প্রতিক এক জাতীয়ভিত্তিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ৬৩২ জন (যাদের বয়স প্রায় ৩২ শতাংশ ৪৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী, ২৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সী প্রায় ৫৩ শতাংশ, ২৪ বছরের কম বয়সী ১৫ ভাগ) উত্তরদাতার মধ্যে ৪৫ শতাংশ জানিয়েছেন তারা কখনোই স্কুলে যান নি অথচ এদের মধ্যে ৮৫ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, তাদের বাড়ির কাছাকাছি স্কুল রয়েছে। বাকি উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৬.৪ শতাংশ কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছেন। দলিত জনগোষ্ঠীর উপরোক্ত উত্তরদাতাদের মধ্যে স্নাতক ও তার উপরের শ্রেণিতে অধ্যয়নকারী পাওয়া গেছে মাত্র ১.৯ শতাংশ। ৭২ ভাগ বলেছেন, তাদের পরিবারের ছেলে-মেয়েরা এখন স্কুলে যাচ্ছে। এখনও প্রায় ২৯ ভাগ দলিত পরিবারের ছেলে-মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে না। ফলে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে দলিতদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা বাড়লেও দলিতরা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে যাদের বিরাটসংখ্যক এখনো নিরক্ষর। যেহেতু সমাজে এখনো জন্ম বা বংশ ও পেশাগত বিবেচনায় অস্পৃশ্যতার উপস্থিতি বিদ্যমান সেকারণে তারা বিদ্যালয়ে ঐতিহাসিকভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত। এর সাথে তাদের নিত্য সাথী রয়েছে দারিদ্র্য। আবার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকায় দারিদ্র্যও তাদের পিছু ছাড়ছে না। এভাবে অস্পৃশ্যতা-অশিক্ষা-দারিদ্র্য ইত্যাদির দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে তারা।

জনগণের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের আর সেই মর্মে বাংলাদেশের সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ১৭) সবার জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। যা সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ (অনুচ্ছেদ ২৭) ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদের (অনুচ্ছেদ ১৩, ১৪) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক, সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, রাষ্ট্রের অবশ্যই পালনীয় এবং ধারাবাহিকভাবে অর্জনযোগ্য। এ লক্ষ্যে সরকার আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সনদ ও ঘোষণাপত্র অনুমোদন ও অনুসাক্ষর করেছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো সকলের জন্য শিক্ষা (জমিতিয়ান ডিক্লারেশন, ১৯৯০) ও ডাকার কনফারেন্স (২০০০) এবং সে অনুযায়ী এমডিজি অর্জনের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০০৩-২০১৫)। আবার জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষে বলা হয়েছে, জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা হবে। এ ছাড়া শিক্ষানীতিতে এও বলা হয়েছে যে, দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো হবে।

খসড়া শিক্ষা আইনে (২০১৩) বলা হয়েছে, প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার জন্য স্ব স্ব মাতৃ ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সংবিধান ও জাতীয় শিক্ষানীতির মতো শিক্ষা আইনেও কোথাও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে দলিতরা স্বীকৃতি পায় নি। যদিও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধীদের কথা বলা হয়েছে। ফলে দলিতরা সংবিধানের 'অন-গ্রসর' [২৪(৮)] এর মতো 'অন্য কোনো কারণে বঞ্চিত [২ (ঢ)]' পর্যায়ে রয়ে যাবে। আর মাতৃভাষা বলতে যে শুধু বাংলাকেই বুঝাবে তা বোঝা যাচ্ছে অন্যান্য ভাষার বই বাংলায় অনুবাদ এবং শিক্ষাদানের মাধ্যম বাংলা ভাষার কথা বলা হয়েছে [৩২(১)], [৫০(১)]। আদিবাসীদের ৬টি জনগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এখন পর্যন্ত অবাঙালি দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারিভাবে তাদের মাতৃভাষা শিক্ষা ও মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি আলোচনাতেই আসা শুরু করে নি। শিশুদের মাতৃভাষার শিক্ষার ধারণাকে বিবেচনা করা হয় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ক্ষেত্রে ভাষাগত প্রান্তিকতার কারণে বাদপড়া শিশুদের মূলধারার কার্যক্রমের আওত-ায় নিয়ে আসার একটি পন্থা হিসেবে। আমাদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এ সকল অবাঙালি দলিত পরিবারের বয়োঃজ্যেষ্ঠরা একধরনের 'টোল' জাতীয় পদ্ধতিতে কোথাও কোথাও তাদের শিশুদের নিজ ভাষার বর্ণ পরিচয় অব্যাহত রেখেছে। এ ধরনের রাষ্ট্রীয় অবজ্ঞা আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষার চেতনার পরিপন্থী। যদিও খসড়া শিক্ষা আইনে অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার (Inclusive education) কথা বলা হয়েছে, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, নৃ-গোষ্ঠী প্রভৃতি বিবেচনায় এনে সকল বঞ্চিত শিশুর সম-সুযোগভিত্তিক শিক্ষার অধিকার ও অনুকূল পরিবেশ নি-শ্চিত করার কথা বলা হলেও এর কোনো প্রতিফলন অতিপ্রান্তিক দলিত শিশুদের

ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যেমন হিন্দি, তেলেগু, জব্বলপুরি, ভোজপুরি প্রভৃতি ভাষাভাষী দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য মাতৃভাষা ও মাতৃভাষায় শিক্ষার সরকারি কোনো ব্যবস্থা নাই।

কিন্তু শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে দলিত জনগোষ্ঠী অস্পৃশ্যতা, নানা সামাজিক বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, ফলে তাদের একটি বড় অংশ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেমন, নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার চর আমিনউল্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র রুহি জলদাসকে শুধুমাত্র দলিত হবার কারণে পিটিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছেন। এমনকি ঐ স্কুলে দলিত শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের দ্বারা উপহাস-তামাশা, নানা বৈষম্য ও অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন। এছাড়া নানা সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের দু' একটি শিরোনাম থেকেও দলিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষাক্ষেত্রে বঞ্চনার বিষয়টি ফুটে উঠে। যেমন- ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭ *দৈনিক জনতা* এবং ৯ নভেম্বর ২০১০ তারিখ *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর শিরোনাম ছিল যথাক্রমে এ রকম, 'পরিচয় গোপন করে সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করাতে হয় হরিজনদের' ও 'স্কুলে পরিচয় গোপন করে ওরা'। এখনো অনেক ক্ষেত্রে দলিত সম্প্রদায়ের শিশুদের ভর্তির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনীহা, শিক্ষক ও সহপাঠীদের অসম আচরণ, খেলাধুলাসহ নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা। যশোরে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে দলিত শিক্ষার্থীদের বের করে দেওয়া হয়েছে তোরা 'ছোট জাতের' মানুষ বলে। দারিদ্রতার কারণে যাতায়াত ও যোগাযোগ, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষা বিষয়ে অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধা না পাওয়া, দলিত হওয়ার কারণে সামাজিক বঞ্চনা, অভিভাবকদের শিক্ষার প্রতি অনীহা, শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেকারত্ব, কাজের সুযোগ না পাওয়া ইত্যাদি কারণে তারা শিক্ষা গ্রহণ থেকে পিছিয়ে পড়ছে।

২০০৮ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময় থেকেই তারা কোনো না কোনোভাবে বঞ্চনার শিকার হয়। যেমন, হিন্দু দলিতদের মধ্যে শতকরা ২১ জন ও মুসলিম দলিতদের মধ্যে শতকরা ২৭ জন স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে এবং শতকরা ১৩ জন হিন্দু দলিত ও শতকরা ৪৭ জন মুসলিম দলিত শিক্ষার্থী বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন। এছাড়া শতকরা ২৯ জন হিন্দু দলিত ও শতকরা ৩৬ জন মুসলিম দলিত মনে করেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি কিংবা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা ব্যাপক বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হন।

ঢাকার রিশি/**ঋষি** সম্প্রদায়ের ওপর এক গবেষণায় দেখা যায়, মাত্র ৩০ শতাংশ (১৫ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা, ১২ শতাংশ মাধ্যমিক এবং ৩ শতাংশ ভকেশনাল শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা একবারেই অনুপস্থিত) সাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন যখন ঐ সময়ে জাতীয় হার ছিল ৬৫ শতাংশ (২০০৩)। এদিকে তাদের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার মাত্র ৩৮ শতাংশ। অন্য এক গবেষণা বলছে, প্রাথমিক স্তরে ভর্তির সুযোগ পেলেও দলিতদের মধ্যে ঝরে পড়ার হার অত্যাধিক দেখা যাচ্ছে, ৩২.৪ শতাংশ প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা নিলেও মাত্র ১০.৪ ভাগ প্রাথমিক স্তরের গণ্ডি পার হতে পারছে, আর মাত্র ৭.৮ শতাংশ অষ্টম শ্রেণি, ২.৯ শতাংশ এসএসসি, ০.৭৬ শতাংশ এইচএসসি পাশ করতে পেরেছে।

দলিত শিক্ষার্থীরা যে পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠে সেখানে শিক্ষার পরিবেশ একেবারেই অপ্রতুল। বাসস্থান সমস্যার তীব্রতার কারণে এক ঘরের মধ্যে তিন প্রজন্মকে বাস করতে হয় ফলে বাড়িতে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার সুযোগ তাদের খুবই কম। গণকটুলির এক পরিবারের উদাহরণ দেওয়া যাক। সেখানে প্রতিটি রুমের আয়তন হলো ১৩৫ বর্গফুট। এই জায়গার মধ্যে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, মেয়ে জামাই একত্রে বাস করে। কলোনির ৪র্থ তলার বাসিন্দা ছেদিলাল (৭০), তার ৩ ছেলে, ১ মেয়ে, ২ নাতি, ১ ছেলের বউ, ও নিজের স্ত্রীসহ ৯ জন একত্রে বসবাস করেন। একই তলার সুরেশ দাসের (৬০) ৬ ছেলে, ৫ মেয়ে, ৩ ছেলের বউ, ৩ নাতি ও নিজেরা ২ জন। এহেন পরিস্থিতিতে যারাও বা শিক্ষার উদ্দেশ্য **হাসিলের** জন্য বিদ্যালয়ে গমণ করছে তাদের বাড়িতে এসে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার সুযোগ কতটুকু পাচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।

দলিত শিক্ষার্থীরা যে পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠে সেখানে শিক্ষার পরিবেশ একেবারেই অপ্রতুল। বাসস্থান সমস্যার তীব্রতার কারণে এক ঘরের মধ্যে তিন প্রজন্মকে বাস করতে হয় ফলে বাড়িতে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার সুযোগ তাদের খুবই কম।

গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, যদিও দলিত শিক্ষার্থীদের স্কুল গমণের হার বর্তমানে বাড়ছে– কিন্তু তাদের মাঝে ঝরে পড়ার হারও অত্যধিক। প্রায় ৬৩ ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, তাদের পরিবারের স্কুল পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা একপর্যায়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়নি এমন উত্তরদাতা রয়েছেন ৩৭ ভাগ। **ঝরে পড়ার এই হার দলিতদের মাঝে উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যা একেবারেই নগন্য হওয়ার অন্যতম কারণ।** দলিত শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার বহু কারণ আছে। সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে দেখা গেছে, দারিদ্র্যকে। ৭৪.৩ ভাগ ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, আর্থিক কারণে তাদের শিক্ষা জীবনে ব্যাঘাত ঘটেছে। পরবর্তী কারণ হিসেবে প্রায় ১৯ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন, পারিবারিক কাজে সহায়তার কথা। উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা স্কুলে যায় নি বা যাদের পরিবারের শিশুরা স্কুলে যায় না তাদের কাছে এর কারণ

জানতে চাইলে ৮৪.৩ ভাগ পারিবারিক দারিদ্র্যের কথা বলেছেন। ১১.৬ ভাগ বলেছেন, দলিত হিসেবে স্কুলে শিক্ষার্থীদের নানাভাবে অবজ্ঞা করা হতো এজন্য স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়। ৯.১ শতাংশ বলেছেন, তাদের কেউ স্কুলে পাঠায় নি– অর্থাৎ অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতনতা বা উৎসাহ ছিল না। ৭.৬ ভাগ জানিয়েছেন– তাদের বাড়ির নিকটবর্তী কোনো স্কুল নেই। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৬.১ শতাংশ দলিত হয়ে স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার কথা জানিয়েছেন। প্রায় ৭৪ ভাগ বলেছেন, সাধারণভাবে সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে কোনো সমস্যায় পড়েন না তারা। উত্তরদাতাদের প্রায় ৩০ শতাংশ জানিয়েছেন, সহপাঠি ও অন্যান্য ক্লাসের সাধারণ শিক্ষার্থীরা দলিত শিক্ষার্থীদের স্কুলে অবজ্ঞা করে। শিক্ষকদের তরফ থেকেও অবজ্ঞার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন ১৬.৩ ভাগ শিক্ষার্থী। প্রায় ৪১ জন উত্তরদাতা (৬.৫%) বলেছেন, অবজ্ঞার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের পৃথকভাবে বসতে হয়। প্রায় ১২ ভাগ ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা বলেছেন, অস্পৃশ্যতা বা অবজ্ঞাসূচক মন্তব্যের কারণে শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়েছে। ৩০ ভাগ উত্তরদাতা স্কুলে অবজ্ঞার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। অনেক দলিত কলোনিতে ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে যে ভাষায় কথা বলেন স্কুলে তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় লেখাপড়া শুরু হওয়ায় এবং শিক্ষকরা ভিন্নভাষার মানুষ হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ে দলিত শিশুদের স্কুলে আগ্রহের সঙ্গে ধরে রাখা কঠিন হয়। এখানেও মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে।

মোট ৩৭ জনের মধ্যে ১৯ শতাংশ জানিয়েছেন যে জাতিগত পরিচয়ের কারণে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে তাদের সমস্যা হয়েছিল। অন্যদিকে, প্রায় অর্ধেক [৪৯%] শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, বংশ ও জাতিগত পরিচয় জেনে সতীর্থরা অনেক সময় তাদের এড়িয়ে গেছে। প্রায় অনুরূপসংখ্যক উত্তরদাতা জানিয়েছে, শ্রেণিকক্ষের বাইরেও তারা একই ধরনের আচরণের শিকার হয়েছে। অন্তত ৩২

শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছে, উপরোক্ত কারণে তারা শিক্ষকদের তরফ থেকে অবহেলা বা অবজ্ঞা পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে সুইপার কলোনির শিশু হওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে শিশুদের নিরুৎসাহিত করা হচ্ছিল। দেখা গেল শিশুরা ভর্তি হলেও তাদের আলাদাভাবে স্কুলের মাটিতে বসতে হয়েছে এবং তাদের দিয়ে ময়লা পরিস্কার করিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্যকেই এই শিক্ষার্থীরা শিক্ষা জীবন চালু রাখার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন [প্রায় ৬৮ শতাংশ]। আর ৩২ শতাংশ বলেছেন, শিক্ষা জীবনের বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে তাদের মনে হয়েছে পারিবারিক বংশ ও পেশাগত পরিচয়।

দলিতরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতেও নিরুৎসাহিত হন। প্রচণ্ড প্রতিকূলতা ও সংগ্রামের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করার সক্ষমতা অর্জন করেছেন কিন্তু তাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা অনুযায়ী উপযুক্ত চাকুরি পাচ্ছেন না। তাদের জন্মগত পরিচয় জানার পর চাকুরিদাতারা চাকুরি দিতে চায় না। বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা করেও অনেকেই যোগ্য চাকুরি পাচ্ছেন না। দলিত আন্দোলনের নেতা নির্মলচন্দ্র দাসের ভাষায়: 'উচ্চশিক্ষিত হলেও ছেলে মেয়েরা সেরকম কাজ তো পাচ্ছে না। আগে তো ফ্যামিলিতে কেউ বড় হলেই সিটি কর্পোরেশনের কাজ পেত। এখন সেখানেও কাজ নেই। আবার যারা বাইরের বড় কাজের আশায় স্কুলে-কলেজে যাচ্ছে তারাও হতাশ। ফলে কলোনিতে বিপুলসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত বেকার তৈরি হয়েছে। এদের করুণ অবস্থা দেখে অভিভাবকরা ছোটদের শিক্ষিত করার ব্যাপারে খুব আর উৎসাহ পাচ্ছেন না। এর ফলে শিক্ষার প্রতি একটা নেতিবাচক মনোভাবও আছে'। এ প্রসঙ্গে গণমাধ্যমে প্রকাশিত একটি খবরের উল্লেখ করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়। চাকুরি প্রার্থী যুবকের প্রতি 'তুই মুচির ছেলে, তোর চাকুরি হবে না'- এ ধরনের কটূক্তি করে প্রার্থীকে রুম থেকে বের করে দেন কলোরোয়া উপজেলার জালালাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। এখানে উল্লেখ্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ট্রাইবালদের জন্য ৫ ভাগ কোটার ব্যবস্থা রয়েছে যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৭ জন ২৪তম, ৮ জন ২৫তম, ২ জন ২৬তম (বিশেষ), ১৮ জন ২৭তম এবং ১১ জন ২৯তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যোগ্যতা অনুযায়ী দলিত ছেলেমেয়েরা চাকুরি না পেলে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ বাড়ানো কঠিন হয়ে যাবে।

দলিত নারীর শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের শিক্ষা থাকলেও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার অত্যধিক। ফলে শিক্ষায় দলিত

নারীর প্রতি বিশেষ নজর না দিলে তাদের শিক্ষা বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা দূর হবে না। বাল্যবিবাহ, কলোনির বাইরে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, পঞ্চায়েত নেতাদের অনাগ্রহ, নারী হিসেবে প্রান্তিকতা ইত্যাদি কারণে তারা পিছিয়ে পড়ছে। সংগঠকদের অভিমত, জরিপের তথ্য ও দলভিত্তিক আলোচনা– সকল অনুসন্ধান থেকেই দলিত নারীদের বহুবিধ বিপন্নতা দেখা গেছে। প্রথমত, দলিত নারীদের খুব কম বয়সে বিয়ে হচ্ছে; ১৫ বছরে আগেই এটা ঘটছে। দ্বিতীয়ত, মেয়েদের বিয়েতে বড় অংকের যৌতুক দিতে হয়। শিক্ষিত মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষিত ছেলে পাওয়ার পথে আরও বেশি যৌতুক প্রয়োজন হয়। যার ফলে অভিভাবকরা মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে অনিচ্ছুক।

তবে আশার কথা হলো, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ইস্যুকৃত নির্দেশনামূলক পত্রে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তির কোটা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে । এ ছাড়া, কিছুসংখ্যক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও দলিত জনগোষ্ঠির শিক্ষা সহায়তায় কাজ শুরু করেছে যা আশার কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবারের মতো দলিত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভর্তির কোটা প্রবর্তন করেছে। এখানে উল্লেখ্য, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে আদিবাসীদের নির্ধারিত কোটা রয়েছে।

দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বাজেট প্রয়োজন। অতিদরিদ্র ও বিশেষ প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য (যেমন- দারিদ্রপীড়িত এলাকায় খাদ্য বিতরণ, ঝরে পড়া শিশুদের জন্য বৃত্তি, শহরের কর্মজীবী শিশুদের মৌলিক শিক্ষা, প্রতিবন্ধিদের বৃত্তি ও প্রতিবন্ধিদের জন্য পরিচালিত বিদ্যালয়ে সহায়তা) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে যেভাবে পৃথক বাজেটের ব্যবস্থা রয়েছে দলিত শিক্ষার্থীদের জন্যও তা প্রয়োজন।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার। শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি তার মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়, অধিকতর সচেতন হয়, নিজের অধিকার অর্জনে সোচ্চার হয়। ফলে ব্যক্তি হিসেবে সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি সমাজ তথা নিজ জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধতার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো বাংলাদেশ সরকারও বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি সামাজিক বঞ্চনা ও বৈষম্যের কারণে তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। ফলে দলিত জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারছে না।

বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহুবিধ বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। তাদের বঞ্চনার ধরন, দারিদ্র্যের ধরন, সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান ভিন্ন হওয়ায় সম্প্রদায়ের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে দলিত জনগোষ্ঠীভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। তথাকথিত মূলধারার শিক্ষার পঠন-পাঠনের সাথে সমন্বয় করে তাদের শিক্ষার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি। সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দলিত শিক্ষার্থীদের দিকে সকলকে নজর দিতেই হবে, নইলে তারা 'মিসিং কমিউনিটি' হিসেবে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকেই যাবে। পেশা ও জন্মের ভিত্তিতে বৈষম্য কার্যকরভাবে দূরীকরণের লক্ষ্যে জাতিসংঘের খসড়া নীতিমালা ও নির্দেশনাবলীতে বলা হয়েছে, জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের উচিত ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য অবৈতনিক, গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় সমপ্রবেশাধিকার, অধিকন্তু উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সমসুযোগ নিশ্চিত করতে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকারি ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের জন্য বিশেষ কার্যকর ব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত। সুতরাং, কোনো ধরনের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা যেন দলিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে না পারে সে ব্যাপারে জনসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি সবাইকে সজাগ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রস্তাবনা:

১. দলিত জনগোষ্ঠীর শিশুদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা ও শিক্ষা সহায়তা প্রদান।

২. শিক্ষার সকল স্তরে দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে শিক্ষার কোনো স্তর থেকেই ঝরে না পড়ে।

৩. যেসকল এনজিও শিক্ষা বিস্তারে কাজ করছে তাদের দলিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বিষয়ে নজর দিতে হবে।

৪. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষার সকল স্তরে দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যাডেট কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহেও ন্যূনতম কোটার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৫. পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে দলিত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকারিভাবে বৃত্তির ব্যবস্থা করা।

৬. শিক্ষিত দলিতদের চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী কোটা প্রবর্তন করা।

৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দলিতদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা

৮. অবাঙালি দলিত শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত মাতৃভাষা থেকে বাংলার সাথে ব্রিজিং পদ্ধতি রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করা;

৯. দলিত নারী শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় উৎসাহ প্রদানে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যাতে তারা শিক্ষা চালিয়ে যেতে উৎসাহী হয়।

১০. প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে দলিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধিবিধানের উল্লেখ থাকা।

১১. শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দের এক অংশ দলিতদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে একটি সেল খোলা।

১২. সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দলিতদের জন্য কারিগরি শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করা।

মাজহারুল ইসলাম : লেখক ও গবেষক।
ইমেইল : mazhar1971@yahoo.com

আফসানা বিনতে আমিন : উন্নয়নকর্মী।
ইমেইল : afsana_amin@yahoo.com

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত: সামাজিক সুরক্ষা, আইন ও নীতিমালার অনুসন্ধানে

১. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত

বাংলদেশে শ্রম আইনে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সংজ্ঞা দেওয়া না হলেও, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ২০০৬-এ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে, 'অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত এইরূপ বেসরকারি খাত যেখানে কর্মরত শ্রমিকের কাজের বা চাকুরীর শর্ত ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধিবিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত'। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত মূলত যেখানে শ্রম আইন বিশেষ করে কারখানা, শ্রমিক নিয়োগ আইন, মজুরি বিধিমালা, ক্ষতিপূরণ, শিল্প-শ্রমিক আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় না। এই খাতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য পারিবারিক মালিকানা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বা ব্যবসা বাণিজ্য, শ্রমঘন এবং দেশীয় প্রযুক্তি নির্ভরতা এবং আন্তঃদেশীয় বাজার নির্ভরতা ইত্যাদি। এক কথায় শ্রম আইন যে খাত এবং তার শ্রমিকদের স্বীকৃতি দেয় না, তাই অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক খাত।

দেশে প্রচলিত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতগুলো হলো: নির্মাণ কাজ, চিংড়ি চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইটভাটার কাজ, গার্হস্থ্য কাজ, টোকাইয়ের কাজ, হকার, হোটেল রেস্টুরেন্টের শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, ডক শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, গৃহশ্রমিক, হাতের কাজ, সেলাইয়ের কাজ, দর্জির কাজ, শুটকি মাছ প্রক্রিয়াজকরণ, বালুপাথর বহন ইত্যাদি।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন-মজুরি শ্রমিক, স্বনিয়োজিত শ্রমিক ও পারিশ্রমিক ছাড়া পারিবারিক শ্রমিক। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের একটি তুলনামূলক চিত্র নিচের সারণিতে (সারণি-১) দেওয়া হলো।

২. আমাদের অর্থনীতি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত:

পুঁজি, দক্ষতা, শিক্ষা ও প্রযুক্তির নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই খাতের শ্রমিকরা তাদের কাজের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশেষ অবদান রাখছে। আমাদের জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ-এর যোগানদাতা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ভূমিকা ব্যাপক। লেবার ফোর্স সার্ভে-২০১০ অনুসারে শ্রমবাজারে নিয়োজিত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪৭.৩ মিলিয়ন যা প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রম শক্তির প্রায় আট (৮) গুণ।

অপ্রাতিষ্ঠানিত খাতের শ্রমিকদের অর্ধেকই প্রায় নারী। প্রচলিত মোট জাতীয় আয় (এউচ) পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষের উৎপাদনশীলতার যেখানে প্রায় ৯৮ শতাংশ হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীর উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭ শতাংশ গণনা করা হয়।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মধ্যে কোনো কোনো খাত শ্রম আইন দ্বারা স্বীকৃত হলেও শ্রমিক নিয়োগে নিয়োগপত্র, ছাটাই, নিরাপত্তা প্রভৃতিতে রয়েছে যথেষ্ট অব্যবস্থাপনা ও বৈষম্য। অথচ তাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই। তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো আইন বা নীতিমালা নেই। এরা কর্মক্ষেত্রে নানারকম নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা ও অন্যায্যতার শিকার। তাদের সুরক্ষা দিতে উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

৩. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের আইন ও নীতিগত অধিকার:

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোনো আইন প্রণীত হয়নি, নেই কোনো নীতিমালাও। অথচ জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান একজন নাগরিক হিসেবেই অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিককে সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার প্রদান করেছে।

ক. জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ-এর ধারা ২৩-এ বলা হয়েছে-

১. প্রত্যেকেরই কাজ করার, স্বাধীনভাবে

প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক	অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক
নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র আছে	নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র নেই
নির্দিষ্ট কর্মঘন্টা আছে	নির্দিষ্ট কর্মঘন্টা নেই
নির্দিষ্ট মজুরী কাঠামো আছে	নির্দিষ্ট মজুরী কাঠামো নেই
সাপ্তাহিক ছুটি আছে	সাপ্তাহিক ছুটি নেই
অর্জিত, উৎসব, চিকিৎসা ও মাতৃত্বকালীন ছুটি আছে	অর্জিত, উৎসব, চিকিৎসা ও মাতৃত্বকালীন ছুটি নেই
চাকুরীর বিধিমালা আছে	চাকুরীর বিধিমালা নেই
পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সুরক্ষিত	পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সুরক্ষিত নয়
সামাজিক সুরক্ষা আছে	সামাজিক সুরক্ষা নেই
চাকুরীর বয়সসীমা আছে	চাকুরীর বয়সসীমা নেই
অবসরকালীন ভাতা আছে	অবসরকালীন ভাতা নেই
শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃত	শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃত নয়
ট্রেড ইউনিয়ন ও সিবিএ করার অধিকার আছে	ট্রেড ইউনিয়ন ও সিবিএ করার অধিকার নাই
পেশাগত নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণের অধিকার আছে	পেশাগত নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণের অধিকার নেই

চাকুরি বেছে নেবার, কাজের ন্যায্য এবং অনুকূল পরিবেশ লাভ করার এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে।

২. প্রত্যেকেরই কোনোরূপ বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাবার অধিকার আছে।

৩. কাজ করেন এমন প্রত্যেকেরই নিজের এবং পরিবারের মানবিক মর্যাদার সমতুল্য অস্তিত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারে এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক লাভের অধিকার রয়েছে; প্রয়োজনবোধে একে অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাদির দ্বারা পরিবর্ধিত করা যেতে পারে।

৪. নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেকেরই ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং তাতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

খ. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-

অনুচ্ছেদ ১৫: রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতা-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্ত্বাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার।

অনুচ্ছেদ ২০: সংবিধানের (১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং 'প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী'-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

৪. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও আইএলও:

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর ১৯৯৩ সালের সংজ্ঞা অনুসারে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত (Informal Sector) বলতে এমন একটি খাত বোঝায় যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়া এমন একটি ক্ষুদ্র পরিসরে চলে যেখানে সাংগঠনিক কাঠামো নেই বললেই চলে, আর সেই সঙ্গে শ্রম ও পুঁজির দ্বৈরথ খুঁজে পাওয়া ভার এবং বহুলাংশে কোনো চুক্তির মাধ্যমে বা আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তির মাধ্যমে শ্রমিকের নিয়োগ হয় না। বরং ব্যক্তিগত বা পরিবার কিংবা সামাজিক সম্পর্ক বলয়ের ভিত্তিতে এ ধরনের শ্রম ও শ্রমিকের অবস্থান।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করার জন্য ILO নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করেছে: সহজে প্রবেশ করা যায়; প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ঘাটতি; কম মজুরি; বাধ্যতামূলক ওভার টাইম; মৌলিক অধিকার অস্বীকার; চাকুরির কম নিশ্চয়তা; কর্মচুক্তি না থাকা; দেশীয় সম্পদ নির্ভরতা; ক্ষুদ্র আকারের পরিচালনা প্রণালী; শ্রম ঋণ ও যন্ত্রসহায়ক; অনিয়ন্ত্রিত ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার; উদ্যোক্তা কর্তৃক সরাসরি তার পণ্য ভোক্তার কাছে বিতরণ; সুনির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী পরিচালিত।

৫. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর অংশগ্রহণ:

দারিদ্রতার কারণে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও আজ ঘরের বাইরে এসে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমবাজারে যুক্ত হয়েছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে বেশিরভাগ নারী শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে। তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য খাতের মতোই নারী শ্রমিকদের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতেও অনেক বেশি বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হতে হয়, যা অর্থনৈতিক কাজে নারীর অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্থ করেছে।

নিম্ন মজুরি প্রদান, অস্থিতিশীল আয়, অনির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, ছুটি বা বিশ্রামের সুযোগ না থাকা, ও কাজের নিশ্চয়তা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের সাধারণ সমস্যা হলেও নারীদের ক্ষেত্রে এ সমস্যাগুলো আরও প্রকট। এছাড়াও নারী শ্রমিকদের প্রতি মজুরি বৈষম্য, মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে বঞ্চিত, কর্মক্ষেত্রে শারিরীক ও মানসিক হয়রানি ইত্যাদি সহ্য করেই এ খাতে নারীর টিকে থাকে। এছাড়াও প্রচলিত বিধিবিধান না থাকার কারণে প্রতিনিয়ত তাদের শ্রম শোষণের শিকার হতে হয়। যার ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকা অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে যায়।

৬. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও ট্রেড ইউনিয়ন:

শ্রমিকদের অধিকার আদায়, বৈষম্য, শোষণ, নিপীড়ন কমিয়ে কর্মক্ষেত্র কীভাবে শ্রমিকদের জন্য আরও কর্মসহায়ক করা যায় তার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে কাজ করে একদিকে যেমন শ্রম শক্তির সচলতার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ শ্রমিকদের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের কোনো যোগাযোগ নেহায়েতই কম। এ ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন ব্যর্থতা যেমন দায়ী, সাথে সাথে শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতাও দায়ী। তারপরও প্রাতিষ্ঠানিক খাতে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা লক্ষ্য করা গেলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর নয়।

৭. আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে সাম্প্রতিক উদ্যোগ:

৭.১. প্রস্তাবিত 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১০' ও 'অসংগঠিত শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা (অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত)-২০১৩' শীর্ষক বেসরকারি বিল এবং 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন-২০০৬' ও 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা-২০১৩':

তবে আশার কথা এই যে, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের একটি বড় অংশ গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষায় শ্রম ও কর্মসংস্থান

মন্ত্রণালয় 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১০' এর খসড়া চূড়ান্ত করেছে এবং অনুমোদন-এর অপেক্ষায় এবং নির্মাণ শ্রমিক ও মটর মেকানিকদের জন্য গোষ্ঠীবীমা স্কিম গ্রহণ করেছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের আইনি ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণে ২০১৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি 'অসংগঠিত শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা (অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত), ২০১৩' শীর্ষক একটি বেসরকারি বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারি, বেসরকারি বা ট্রেড ইউনিয়ন কোনো পর্যায় থেকেই যথেষ্ঠ উদ্যোগী না হওয়ার ফলে এই আইন এখনো আলোর মুখ দেখেনি। প্রস্তাবিত এই আইনটি দ্রুত পাশ করার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

৭.২. বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা ২০১৩

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা ২০১৩:

বিধিমালা (নং ৪): ফাউন্ডেশনের তহবিল হইতে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ ও পদ্ধতি-

(১) ফাউন্ডেশনের তহবিল থেকে নিম্নবর্ণিত খাতে নির্ধারিত পরিমাণ অনুদান প্রদান করা যাবে: শিক্ষা বৃত্তি, যৌথ বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ, চিকিৎসা সাহায্য প্রদান, দাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিককে সাহায্য প্রদান, দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাহার পরিবারকে সাহায্য প্রদান, শ্রমিককে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য প্রদান এবং মাতৃত্ব কল্যাণ।

(২) অনুদান বা অর্থ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

(৩) আবেদনপ্রাপ্ত হলে মহাপরিচালক বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনাক্রমে অনধিক ২০,০০০ টাকা (বিশ হাজার টাকা) পর্যন্ত অনুদান প্রদান করতে পারবেন এবং অনুদানের বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

(৪) দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে তার পরিবারের সকল উত্তরাধিকারী সদস্যকে বা ক্ষেত্রমত উত্তরাধিকারীগণের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সদস্যকে অর্থ প্রদান করা যাবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কারণবশতঃ কোনো শ্রমিকের উত্তরাধিকারীগণ ক্ষমতাপত্র প্রদান না করিলে সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র, সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর কর্তৃক প্রত্যায়িত সনদপত্রের ভিত্তিতে নিয়োগকর্তার সুপারিশ অনুযায়ী আবেদনকারীকে তার প্রাপ্য অংশ প্রদান করা যাবে।

শ্রমিকদের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থা এবং প্রিমিয়াম পরিশোধ-

(১) যেকোনো পেশায় নিয়োজিত প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অনধিক ২০০ (দুইশত) শ্রমিক, কোনো সমিতি বা সংগঠনের সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত হোক বা না হোক, এর জীবন বীমা করতে হবে।

- তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৯৯ প্রযোজ্য, এইরূপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।
- আরও শর্ত থাকে যে, কোনো শ্রমিক একাধিক যৌথ বীমা সুবিধার অধিকারী হইবেন না।

(২) যৌথ (গোষ্ঠী) বীমার অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জখমপ্রাপ্তি, অসুস্থতা বা মৃত্যুবরণের তারিখ হতে অনধিক ৩০(ত্রিশ) দিন সময় সীমার মধ্যে আবেদন করতে হবে।

(৩) যৌথ (গোষ্ঠী) বীমা পদ্ধতির মাধ্যমে কেবলমাত্র কর্মরত শ্রমিকদের মৃত্যু ও দুর্ঘটনার উপর ঝুঁকি বীমাকৃত হবে এবং এটি কেন্দ্রীয়ভাবে ফাউন্ডেশন পরিচালনা করবে।

(৪) প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত হতে ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে শ্রমিকের তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

(৫) ফাউন্ডেশন বীমা আইন, ২০১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের বিধান অনুসরণ করে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত এক বা একাধিক জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদনপূর্বক এর আওতায় প্রত্যেক শ্রমিকের জীবন বীমা যৌথ (গোষ্ঠী) বীমা পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন করবে।

৮. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের আইনি ও নীতিগত সুরক্ষায় সুপারিশমালা:

৮.১. সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ:

- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের আইনি ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণে অসংগঠিত শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা আইন (অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত), ২০১৩ ও গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১০ দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সকল শ্রমিককে শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।
- এ খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করা এবং সরকারিভাবে এ খাতের নারী শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা;
- এ খাতের শ্রমিকদের স্বল্প আয়ের বাসস্থান, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ সকল প্রকার নগর সেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সরকারি ও বেসরকারিভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যগত ও পেনস্ন বীমার উদ্যোগ নেয়া;
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের উদ্যোগে নগর দরিদ্র ব্যাংক চালু করা এবং এ বিষয়ে সরকারি সহযোগিতা প্রদান;
- কাজের উপযুক্ত পরিবেশ, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ;
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটে প্রতিবছর বরাদ্দ করা।

৮.২. ট্রেড ইউনিয়ন-এর উদ্যোগ:

- সংগঠিত করা ও ইউনিয়নভূক্ত করা;
- ট্রেড ইউনিয়ন-এর মূলধারার আন্দোলনে যুক্ত করা;

- আইন ও নীতিমালা গ্রহণে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা।

৮.৩. বেসরকারি উদ্যোগ যা হতে পারে:

- সঞ্চয়, ঋণ, বীমা ও সমবায় তৈরি-এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সেবায় অংশগ্রহণে সহায়তা;
- নতুন সদস্যদের ও তাদের পরিবার যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তা হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা, যেমন- স্বাস্থ্যসেবা, শিশু সেবা এবং শিক্ষা ইত্যাদিতে সহায়তা;
- শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও শিশুদের জন্য সম্পূরক শিক্ষা প্রদান;
- সংগঠিত সদস্যরা যাতে কর্মসূচি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য সমন্বিত ও সংগঠিত শক্তি তৈরিতে সহায়তা করা;
- নারী সদস্য বিশেষ করে হকার, নির্মাণ শ্রমিক এবং গৃহকর্মীদের সংগঠিত করা ও এদের মধ্যে মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি;
- উন্নয়ন ও উপার্জনমূলক কার্যক্রম, যেমন- এ্যামব্রোয়ডারির কাজ, ক্ষুদ্রঋণ এবং ক্ষুদ্রবীমা;
- সরকারের সেবা ও সুবিধা যেমন দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়ানোর জন্য এ্যাডভোকেসি ও প্রচার চালানো।

নিবন্ধটি ২২ জানুয়ারি ২০১৫-এ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি গোলটেবিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক: স্বীকৃতি, অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা' শীর্ষক সেমিনারে শ্রম অধিকার ফোরাম-এর পক্ষে জনাব আবুল হোসাইন ও জাকির হোসেন কর্তৃক উপস্থাপিত। নিবন্ধটি তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন এ এস এম সাদিকুর রহমান।

বাংলার পানিশক্তির অবক্ষয়ের কালে

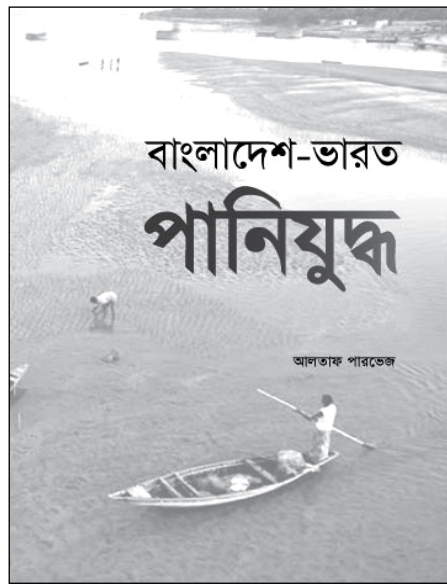

বাংলাদেশ-ভারত পানিযুদ্ধ
আলতাফ পারভেজ
প্রকাশক : তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা।
প্রচ্ছদ: মিঠু আহমেদ
মূল্য : ১২০ টাকা
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১১০
আইএসবিএন : ৯৮৪৭০২২৫০০৮১৮

সেলিম সারোয়ার

বাংলাদেশ বহু সমস্যায় জর্জরিত থাকলেও সচরাচর তার জনগোষ্ঠীর সামাজিক মনোজগত আচ্ছন্ন থাকে রাজনীতি দ্বারা। আর সেই 'রাজনীতি'ও মূখ্যত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি। এটা এখানকার সমাজের এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা।

বর্তমানে বাংলাদেশে অতীত যেকোনো সময়ের চেয়ে আরও অধিক রাজনৈতিক উত্তাপ বইছে। নিরবিচ্ছিন্ন হত্যা-জ্বালাও-পোড়াও-গুম-খুন ইত্যাদির ভেতর দিয়েই এগোচ্ছে দেশ।

এ রকম একটি সময়ে পানিকেন্দ্রিক কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন কতটুকু জাতীয় মনোযোগ পাবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। সেই বিবেচনায় আলতাফ পারভেজ ঝুঁকি নিয়েছেন বলা যায়। অনেকটা ভুল সময়ে একটি জরুরি প্রসঙ্গ সামনে আনতে তৎপর হয়েছেন লেখক।

লেখক শুরুতেই স্বীকার করেছেন, পানিবিজ্ঞানের ছাত্র নন তিনি। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারতের পানিবিবাদের ময়নাতদন্ত ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার আসন্ন পানি সংকটের পুরো চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি বিস্তর কারিগরী উপাত্তসহ।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে ছয়টি অধ্যায় রয়েছে এ রকম:

এক.
দক্ষিণ এশিয়ার পানি ব্যবস্থাপনা, পানি-কূটনীতি ও আসন্ন পানিযুদ্ধ

দুই.
ফারাক্কা ব্যারাজ: বাংলাদেশ যখন কৃতজ্ঞতার ফাঁদে

তিন.
টিপাইমুখ বহুমুখী প্রকল্প: সরাসরি ঝুঁকিতে বাংলাদেশের আট হাজার বর্গমাইল

চার.
কেন-বেতোয়া কৃত্রিম সংযোগ খাল, ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্প এবং

বাংলাদেশে এর প্রভাব পর্যালোচনা

পাঁচ.
তিস্তা চুক্তি অনিশ্চিত;
যদিও করিডর সুবিধা পেয়ে গেছে ভারত

ছয়.
আন্তর্জাতিক পানি আইন ও প্রথার আলোকে বাংলাদেশ-ভারত পানি বিবাদ

উপরোক্ত প্রতিটি অধ্যায়ই লেখা হয়েছে কয়েক দশকের প্রয়োজনীয় কারিগরী তথ্যসহ। পাশাপাশি এসেছে বাংলাদেশ-ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার পানিকেন্দ্রিক কূটনীতির আদ্যপান্ত। বইটির দীর্ঘ একটি ভূমিকা লিখেছেন দেশের নদীরক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক হাসনাত কাইয়ূম। তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পানিনীতি ও পানি সুরক্ষা কৌশলের ঐতিহাসিক এক মূল্যায়ন হাজির করেছেন যা গ্রন্থের গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

এটা আমরা জানি এবং হরহামেশা গণমাধ্যমে শুনি যে, বাংলাদেশের গ্রামজীবন মানেই পানিবিধৌত সভ্যতা। বাংলাদেশের প্রাণপ্রবাহ যদি বলা হয় গ্রামকে– তা হলে তার প্রাণভোমরা বলতে হবে পানির উৎসগুলোকে। পুকুর, দিঘী, খাল, নদীই গ্রামীণ বাংলার প্রাণশক্তি। আর এগুলোকেই যেন ছায়া দিয়ে রেখেছে পাশের সমুদ্র।

বিশ্বের অনেক দেশেই নদী, খাল, সাগর রয়েছে। কিন্তু নদী প্রবাহের উপর প্রাণ বৈচিত্র্যের এত সর্বগ্রাসী নির্ভরশীলতা নিয়ে গড়ে ওঠা সভ্যতা আছে অল্পই– যেমনটি ঘটেছে আমাদের এখানে। কিন্তু বাংলার সেই পানিশক্তিতে ভয়ংকর রকমে টান পড়েছে। জালের মতো থাকা নদী মানচিত্রটি উধাও হতে বসেছে বাংলাদেশ থেকে। অনেক জেলাতেই নদী আছে কেবল জ্যেষ্ঠদের স্মৃতিতে। বাস্তবের নদী উধাও। এতে দেশের স্বাভাবিক অর্থনীতির ধারা পাল্টে যাচ্ছে। জীবনধারা বদলে যাচ্ছে। প্রাণ বৈচিত্র্য নিঃশেষ হচ্ছে। সংস্কৃতির উৎসমুখেও টান পড়েছে।

বস্তুত নদীগুলো শুকিয়ে এই জনপদের ঐতিহাসিক ইকোসিস্টেম প্রায় পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত। আর এসবই ঘটছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আকারে নয়– মনুষ্য সৃষ্টি ধ্বংসলীলা রূপে।

জীবনধারার এই ভূমিকম্পতুল্য পরিবর্তনের মূলে রয়েছে পানি প্রবাহের নিঃশেষ। এ গ্রন্থ সেই পর্যবেক্ষণের আংশিক বয়ান মাত্র। দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে পানি বিষয়ে সম্প্রতি আলতাফ পারভেজ অনেক বিশ্লেষণাত্মক রিপোর্ট লিখেছেন। সেগুলোর কয়েকটি এই গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। এখানে কেবল প্রধান প্রধান নদীগুলো নিয়ে আন্তর্দেশীয় রাজনীতির খেলাটুকু, নির্মম কূটনীতিটুকু চুম্বক আকারে হাজির করার চেষ্টা করা হলেও– সেসব একটিভিস্টদের এটা ভালোই কাজে লাগবে যারা বাংলার নদীনালার ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে লড়ছেন।

প্রতিবেদনগুলো নির্মোহ হলেও লেখকের আবেগের উত্তাপটুকু খোলামেলাভাবেই বোঝা যায় ভূমিকায়। সেখানে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন. 'দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো চলতি পানিযুদ্ধে নীরবতা পালনের নীতি নিয়েছে। দু'একটি বামপন্থী সংগঠনের কিছু সংগ্রামী উদ্যোগ ছাড়া ক্ষমতাকেন্দ্রীক রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ ধ্বংসলীলা মেনে নিয়েছে বলেই মনে হয়।

নতুন শতাব্দির দ্বিতীয় দশকে এসে বাংলাদেশে রাজনীতির এই মোটাদাগের **মোড়** পরিবর্তন লক্ষ্য করার মতো। আন্তর্জাতিক নদীগুলোতে ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহার, বাঁধ-ড্যাম-পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ নিয়ে মূলধারার রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবীতা মুখে কুলুপ এঁটেছে। মিডিয়াকে ভর করে 'পানি বিজ্ঞানী' সেজে অনেকে নানান কুযুক্তির আড়ালে ভাটি অববাহিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে। পানিশূন্যতায়, নদীহত্যায় বাংলাদেশ কীভাবে বাঁচবে তা নিয়ে পুরোপুরি উদাসীন দেশের প্রধান প্রধান গবেষণাকেন্দ্রগুলো।

যে জনপদ হাজার বছরের পানির ধারা আর পলি থেকে তার প্রাণ বৈচিত্র্যকে নির্মাণ করেছে– আগামীতে পানিবিহীন নগরজীবনে তার জন্য কী ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে সে সম্পর্কে নাগরিক সমাজও বিস্ময়কর রকমে উদ্বেগহীন। সম্ভবত এটা কোন অসচেতনতা নয়– এটাই সচেতন বুদ্ধিজীবীতা, এটাই বাংলাদেশের চলতি রাজনীতির প্রধান দিক– পানি দস্যুতায় নীরব থাকতে হবে।'

আগামীতে পানিবিহীন নগরজীবনে কী ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে সে সম্পর্কে নাগরিক সমাজও বিস্ময়কর রকমে উদ্বেগহীন। সম্ভবত এটা কোন অসচেতনতা নয়– এটাই সচেতন বুদ্ধিজীবীতা, এটাই বাংলাদেশের চলতি রাজনীতির প্রধান দিক– পানি দস্যুতায় নীরব থাকতে হবে।

আলোচ্যগ্রন্থ নিঃসন্দেহে সেই নীরবতার দেয়ালে মৃদু এক ঘণ্টাধ্বনি। যদি কেউ শুনতে পায়। শুনতে চায়।

প্রকাশনা হিসেবে এটা অতি ক্ষুদ্র আয়তনের। এই গ্রীষ্মে এত ছোট ফ্রেমে দেশের মূল সংকটে আলো ফেলা সত্যি অনন্য এক চেষ্টা হয়েছে। যা একদিক থেকে খুবই পাঠক-বান্ধব। চটজলতি পড়ে ফেলার মতো। প্রচ্ছদটি অসাধারণ এক শোকগাথার স্মারক। এককালের স্রোতস্বিনী তিস্তা যখন মরা বালুচর। দামও কম বইটির। এর বহুল প্রচার কাম্য।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান-এর *নাগরিকদের জানা ভালো*

সুনাগরিক হয়ে ওঠার সহায়ক এক উপকরণ

ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কি বলেছেন, 'দেশের নাগরিক হয়ে দেশ সম্পর্কে যার ন্যূনতম জ্ঞান নেই, তার সেই দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা অসমীচীন কিছু হবে না।' অবান্তর এই প্রশ্ন তখনই যৌক্তিকতা পায়, যখন দেশের নাগরিকদের মধ্যে ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি নিয়ে সম্যক ধারণার সংকট প্রতিফলিত হয়। নাগরিকদের দেশাত্মবোধ সংক্রান্ত এই সংকট নিরসনে এগিয়ে এসেছেন বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। প্রায় হ্যারল্ড লাস্কির সুরেই বলেছেন, 'আমার মনে হয়, সব নাগরিকের দেশের প্রকৃতি, মাটি ও মানুষ সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা হলেও একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা বিধেয় ও সমীচীন।' এই সমীচীনতার পরিণতিই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সর্বশেষ নাগরিকদের জানা ভালো গ্রন্থে।

সম্প্রতি প্রকাশিত নাগরিকদের জানা ভালো বইয়ের আদ্যোপান্ত পাঠ আমাদের সেই ধারণার দিকেই নিয়ে যায়। মোট ২০টি বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়ের অন্তর্গত ৩৪৮টি উপ-অধ্যায়ের মাধ্যমে দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিসরের গুরুত্বপূর্ণ এমন সব জ্ঞাতব্য দিক তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে জানা একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের জন্য অবশ্যই জরুরি।

বইটির উদ্দেশ্যই হচ্ছে এমন সব বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন করে তোলা, যার মুখোমুখি কখনো না কখনো তাঁরা হয়েই থাকেন। এমনকি এমন সব বিষয়ও এই বইয়ের অন্তর্গত, যে বিষয়ে শোনা থাকলেও একটু বিস্তারিতভাবে জানা হয়নি আগে কখনো। যেমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলোর শিরোনাম

নাগরিকদের জানা ভালো
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
প্রকাশক: প্রথমা প্রকাশন
প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০১৫
পৃষ্ঠা: ১৭৬
মূল্য: ৩৩০ টাকা

যথাক্রমে 'অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)', 'কুৎসা', 'ক্যাঙারু কোর্ট', 'চার স্বাধীনতা', 'টিআইএন', 'ঝুলন্ত পার্লামেন্ট', 'জেব্রা ক্রসিং', 'ফ্লোর লিডার', 'ম্যান্ডেইমাস', 'ন্যায়পাল' ও 'সামাজিক মৃত্যু'। শিরোনামগুলো বেশ কৌতূহলী করে তোলে। অবশ্য শুধু শিরোনাম পড়েই বিষয়ের গভীরে যাওয়া যাবে না, পড়ে জানতে হবে এবং তখন মনে হবে, বইটি পড়ে লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছু হয়নি।

প্রসারিত হলো জানা-শোনার পরিধি। ভাবতে অবাকই লাগে, হাবিবুর রহমান তাঁর মৃত্যুর সামান্য আগেভাগে এই বই রচনার কাজ শেষ করে গিয়েছেন। প্রকাশটা দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু আমরা যখন দেখি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের জ্ঞানপিপাসা কী তীব্র ছিল এবং সেই তীব্রতাই তাঁকে দিয়ে এমন সব বিষয়ের বই রচনা করিয়ে নিয়েছে, যেগুলো বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত পটভূমিতে সত্যিই অদ্বিতীয়।

নাগরিকদের জানা ভালো শিরোনামের বইটি তাঁর তেমনই আরও একটি গ্রন্থ, যার জুড়ি মেলা ভার, বিশেষ করে বিষয়-বৈচিত্র্যে, তাঁর সহজ-সারল্য গুণে এবং হাতের নাগালে থাকার গুরুত্ব বিচারে। একজন নাগরিক জানা-অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতে চান, অথচ হাতের নাগালে সে জাতীয় রেফারেন্স জাতীয় কিছু নেই, এ বই তাদের সেই চাহিদা মেটাবে।

এ বইয়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, বইটি জানা বিষয় সম্পর্কে পাঠককে যেমন নতুন করে জানাবে, তেমনি নতুন অনেক বিষয় সম্পর্কেও তাঁকে তথ্যের যোগান দেবে। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এ বইয়ে এমন সব বিষয় যোগ করেছেন, যেগুলোর পাঠ একজন সাধারণ নাগরিককে সেসব বিষয় সম্পর্কে জানাবে, যা তাঁকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে।

সর্বোপরি, সুনাগরিক হয়ে ওঠার পথে প্রয়োজনীয় জ্ঞানে তাঁর মনকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে। ফলে এ বইয়ের পাঠ যেকোনো একজন নাগরিকের জন্য আনন্দবহ ঘটনা। এটি সংক্ষিপ্ত কলেবরের হাতের নাগালে থাকা প্রয়োজনীয় জ্ঞানকোষস্বরূপ বই।